

কৃষিশিক্ষা

দাখিল
ষষ্ঠ শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ
থেকে দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

কৃষিশিক্ষা
দাখিল
ষষ্ঠ শ্রেণি

রচনা

প্রফেসর মুহম্মদ আশরাফউজ্জামান
প্রফেসর মোহাম্মদ হোসেন ভূঞ্জা
প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ারুল হক বেগ
ড. কাজী আহসান হাবীব
আনোয়ারা খানম
খোন্দকার জুলফিকার হোসেন
এ. কে. এম. মিজানুর রহমান

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. মোঃ সদরুল আমিন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নির্হিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলা ও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্প্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বাংলাদেশ মূলত কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর দেশ। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার, অধিক ফসল ফলনের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং কৃষি বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কৌশলের সাথে পরিচিত করার প্রয়াস নিয়ে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদেরকে কৃষির তত্ত্বায় ও প্রায়োগিক উভয় দিকেই দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রবর্তন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	আমাদের জীবনে কৃষি	১—৮
দ্বিতীয়	কৃষি প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি	৯—২৭
তৃতীয়	কৃষি উপকরণ	২৮—৪৫
চতুর্থ	কৃষি ও জলবায়ু	৪৬—৫৮
পঞ্চম	কৃষিজ উৎপাদন	৫৯—৮৮
ষষ্ঠ	বনায়ন	৮৯—১০৮

প্রথম অধ্যায়

আমাদের জীবনে কৃষি

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। আমাদের জীবনে কৃষি অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ। কেননা কৃষি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানোর প্রায় সকল উপকরণ উৎপাদন ও সরবরাহ করে। এছাড়া অন্যান্য পণ্য ও সেবা ক্ষয়ের অর্ধেও কৃষি যোগান দেয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য খাতের চাহিদাগুলো পূরণে আমাদের জীবনে কৃষি তাই ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

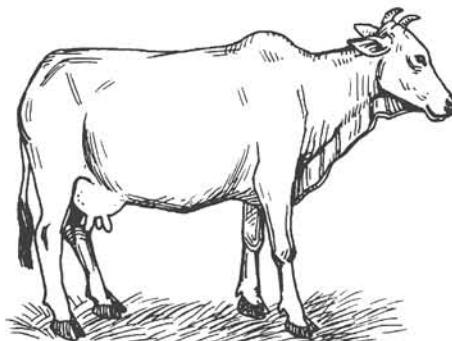
কৃষির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো যেমন: ফসল, পশু-পাখি, মৎস্য ও বনাঞ্চল নিয়েই হচ্ছে কৃষির পরিধি।



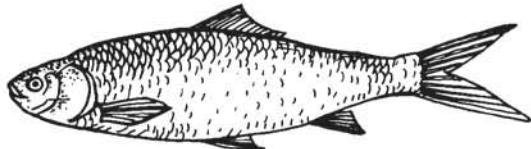
চিত্র : মাঠ কসল



চিত্র : সামাজিক বনাঞ্চল (মাদরাসা)



চিত্র : গরু



চিত্র : কুই শাচ

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বাংলাদেশের কৃষির পরিধি এবং পরিসর ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষিবিষয়ক তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির উৎস চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ -১: কৃষির পরিধি ও পরিসর

কৃষি একটি আদি, আধুনিক এবং অত্যন্ত সম্মানজনক পেশা। কারণ এর মাধ্যমেই মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানো হয়। মানুষের মৌলিক চাহিদা বলতে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষাকে বোঝায়। তাই সংগত কারণে কৃষির পরিধি ব্যাপক। ফসল উৎপাদন, পশু-পালন, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ ও বনায়ন কৃষির অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কৃষি আমাদের খাদ্য যোগান দেয়। ধান, গম, আলু, ভুট্টা, শাকসবজি, ফল-ফলাদি এসব খাদ্য ও পুষ্টি আমরা কৃষি থেকে পাই। পাট, তুলা ও রেশম থেকে কাপড় তৈরির সূতা পাই। কাঠ, বাঁশ, খড়, শন, গোলপাতা ইত্যাদি থেকে গৃহনির্মাণ সামগ্রী ও আসবাবপত্র পাই। বাঁশ, খড়, গবাদি পত্র গোবর, গাছের ডাল ইত্যাদি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করি। কাঠ ও আখের ছোবড়া, বাঁশ ইত্যাদি থেকে কাগজ পাই। আমলকী, হরতকি, বয়রা, ধীনকুনি, বাসক ইত্যাদি থেকে ঔষধ পাওয়া যায়। দুধ, মাংস, ডিম এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার আমরা পেঁয়ে থাকি পশু-পাখি পালন করে। আর এসবই হলো কৃষি। খাদ্য উৎপাদন এবং বস্ত্র, বাসস্থানের উপাদান সরবরাহ করে থাকেন কৃষক। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন কৃষিনির্ভর। তাই কৃষির উন্নয়ন হলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন হবে।

আমাদের এই মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানো হয় বিভিন্ন ফসল উৎপাদন, পশু-পাখি প্রতিপালন, মৎস্য চাষ ও বনায়নের মাধ্যমে। বিভিন্ন ফসল বলতে মাঠ ফসল: দানা, তেল, আশ, পানীয়, ডাল ও উদ্যান জাতীয় ফসলকে বোঝায়। পশু-পাখি প্রতিপালন বলতে স্বাস্থ্যসম্ভাবনে গবাদিপত্র, হাঁস-মুরগি পালন এবং পশু খাদ্য উৎপাদনকে বোঝায়। মৎস্য চাষ বলতে বজ্জ ও মুক্ত জলাশয়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন জাতের মাছের চাষকে বোঝায়। আর বনায়ন বলতে প্রাকৃতিক বনায়ন, সামাজিক বনায়ন এবং কৃষি বনায়নকে বোঝায়।



চিত্র : ধান ক্ষেত



চিত্র : পাট ক্ষেত



চিত্র : গম ক্ষেত

কাজ : পরিবারের প্রতিদিনের গৃহীত খাদ্যের আলোকে কৃষির পরিধি চিহ্নিত কর।

কৃষিশিক্ষা

পাঠ -২ : ফসল, মৎস্য, পশু-পাখি ও বনায়ন

পূর্বোক্ত পাঠে আমরা কৃষির পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। উক্ত পাঠে আমরা কোন কোন বিষয় কৃষির অঙ্গরূপ তা জানতে পেরেছি। এখন আমরা ফসল, মৎস্য, পশু-পাখি বন ও বনায়ন সম্পর্কে বিজ্ঞানিত আলোচনা করব।

(ক) ফসল : ফসল উৎপাদন কৃষি কর্মকাণ্ডের মূল বিষয়। মানুষের খাওয়া ও পরা অর্থাৎ বেঁচে থাকা ফসল উৎপাদনের সাথে উত্তপ্তোত্তভাবে জড়িত। চাষের উপর ভিত্তি করে ফসলকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা - মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসল।

(i) মাঠ ফসল : মাঠ ফসলের মধ্যে রয়েছে ধান, গম, ভুট্টা, পাট, তুলা ইত্যাদি। ধান, গম, ভুট্টা হলো দানা জাতীয় ফসল। দানা জাতীয় ফসল মানুষের প্রধান খাদ্য। দানা জাতীয় ফসল আমাদের শর্করার জোগান দেয়। মসুর, মাষকলাই, মুগ ইত্যাদি ডাল জাতীয় ফসল আমিষ সরবরাহ করে। তেল জাতীয় ফসলের মধ্যে রয়েছে তিল, সরিষা, তিষি, সুর্যমুখী ইত্যাদি। এসব ফসল আমাদের খাদ্যের মেহ জাতীয় উৎপাদন সরবরাহ করে। পাট হচ্ছে আংশ জাতীয় ফসল। পাট আমাদের প্রধান অর্থকরী ফসল। পানীয় জাতীয় ফসল হচ্ছে চা, কফি।



চিত্র : ফলের ঝুঁটি

(ii) উদ্যান ফসল : সারা বছরই কৃষকেরা উদ্যান ফসল উৎপাদন করেন। উদ্যান ফসলের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, ফল, ফুল, মসলা ইত্যাদি। জাউ, শিম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, আলু ইত্যাদি শীতকালের প্রধান সবজি। চাল কুমড়া, বিঞা, চিচিঙা, কচু, পটল, করলা ইত্যাদি গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের সবজি। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য মৌসুমি ফল। আবার পেঁপে, নারিকেল, কলা ইত্যাদি সারা বছর পাওয়া যায়। শাকসবজি ও ফল থেকে আমরা ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ পেয়ে থাকি। সুতরাং বলা যায় ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে আমরা বেঁচে থাকার জন্য প্রায় সকল খাদ্য উৎপাদনই পেয়ে থাকি।

(ধ) মৎস্য : মাছ আমাদের জীবাণু সম্পদ এবং আমিষের প্রধান উৎস। প্রাণিজ আমিষের সিংহভাগ (৬০%) আমরা মাছ থেকে পাই। মাছ আমাদের প্রিয় খাদ্য। তাই আমাদের বলা হয় মাছে-ভাতে বাঞ্ছালি। বাংলাদেশের মাটি ও পানি মাছ চাষের জন্য উপযোগী। এ দেশে চাষযোগ্য মাছের মধ্যে ঝই, কাতলা, ঘুঁগেল, চিংড়ি, থাইপাঙ্গাস, সিলভারকার্প, গ্রাসকার্প, সরপুটি, তেলাপিয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ থেকে চিংড়িসহ অনেক প্রজাতির মাছ বিদেশে বঙ্গানি হচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান মাছ চাষের অনেক প্রযুক্তি বের করেছে। এসব প্রযুক্তির বিস্তার ঘটায় দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের দৈনিক মাথাপিছু মাছের চাহিদা প্রায় ৫৬ গ্রাম। তবে আমরা দৈনিক মাথাপিছু প্রায় ৫২ গ্রাম মাছ পেয়ে থাকি।

(গ) পশু-পাখি : কৃষি কর্মকাণ্ডে বিরাট অংশ জুড়ে আছে পশু-পাখি প্রতিপালন। পশু-পাখি ছাড়া ফসল উৎপাদন ও পুষ্টির কথা ভাবা যায় না। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, তেড়া প্রভৃতি অন্যতম। তন্মধ্যে গরু ও মহিষ হালচাষ ও ভারবাহী হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বর্তমানে যান্ত্রিকশক্তি পশু-পাখির স্থান দখল করলেও এখনও আমাদের দেশে পশুশক্তির প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়নি। কৃষকেরা হালচাষের কাজে গরু-মহিষ ব্যবহার করছেন ব্যাপকভাবে। পাড়াগাঁয়ের গণ্য আনা-নেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে গরু-মহিষের গাড়ি।

গুরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া পালন করে আমরা দুখ ও মাস পাইছি। অন্যদিকে হাঁস-মুরগি, কুতুর, তিতির এগুলো পালন করে আমরা মাস ও ডিম পাইছি।

(ব) বন ও বনারন : গাছপালা থারা আজ্ঞাদিত এলাকাকেই আমরা বন বলি। আর বে পক্ষান্তিতে বন তৈরি হয়, তা-ই হলো বনারন। আমরা আনি, পাশি ও উঁচিদের মধ্যে নিখিল সম্পর্ক আছে। গাছপালা অঞ্জিজেন ত্যাগ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড এহশ করে। আবার পাশি কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে এবং অঞ্জিজেন এহশ করে। কাজেই পাশিকে বাঁচতে হলে গাছপালাকে বাঁচাতে হবে। কোনো দেশের প্রাকৃতিক ভাস্তুসাম্য রক্ষার জন্য সে দেশের মোট আয়ুভনের শতকরা ২৫ ভাগ বনারন থাকা দরকার। বনে বিভিন্ন ধরনের পাখি, পতঙ্গ, কীটপতঙ্গ থাকে। বনের মাঝে একদিকে কাঠ ও জ্বালানির চাহিদা পূরণ হয় এবং অন্যদিকে পরিবেশ জালো থাকে।

কাজ : কৃষির পরিধির আলোকে তোমাদের এলাকার উৎপাদিত উদ্যান ফসল, মক্ষ্য, পশু-পাখি এবং বনের গাছপালার একটি তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : দানা জাতীয় ফসল, ঔল জাতীয় ফসল, টেন্ড্যান ফসল, মাঠ ফসল।

পাঠ-৩ : কৃষিবিষয়ক অর্থোজনীয় তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির উৎস

অঙ্গীকৃত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদর্শ, প্রশিস্পন্দ অধিদর্শ ও মৎস্য অধিদর্শের সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কৃষকদের কৃষিবিষয়ক তথ্যাদি ও সেবা দিয়ে থাকেন। নিচে কে কীভাবে সেবাদান করেন তা আলোচনা করা হলো।

(ক) অঙ্গীকৃত : অঙ্গীকৃত একজন হানীর নেতা এবং একজন পরামর্শদাতা। তিনি বড়চূর্ণ হয়ে হানীর কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখেন ও নতুন নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে পৌঁছাখন রাখেন। এছাড়া তিনি গণমাধ্যম থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। কলে তিনি



চিত্র : কৃষক সভা

হানীর তথ্যভাঙ্গার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সম্প্রসারণ কর্মকর্তারা যখন এলাকা পরিদর্শনে ঘুল, তখন অঙ্গীকৃতকেরা শরণাপন হন এবং তাদেরকে সদে নিয়েই কৃষকদের গৃহ ও ধান্যার পরিদর্শন করেন এবং যাবেমধ্যে কৃষক সভা ও উঠান পৈঠক করেন। এভাবে অঙ্গীকৃতকেরা কৃষি জালের পরিধি বৃদ্ধি করেন। অতঃপর তিনি নিজ এলাকার কৃষকদের কৃষি বিবরে পরামর্শ দান করেন। কৃষকেরা ফসল নিয়ে নালা সফ্যার ভোজনে। যেমন: ফসলের রোগ হওয়া, কীটগতঙ্গ আক্রমণ করা, বন্যা ও খরা দেখা দেওয়া ইত্যাদি। এসব প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য প্রাথমিকভাবে কৃষকেরা অঙ্গীকৃতকের সাহায্য হয়ে থাকেন। আর তিনিশ আত্মিকভাবে বহটাকু জালেন সে মোতাবেক কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

(খ) কৃষিবিষয়ক অধিদপ্তরসমূহ : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কর্মকর্তারা যার ঘার অবস্থান থেকে কৃষকদের তথ্য প্রদান ও সেবা দিয়ে থাকেন। তারা নির্দিষ্ট প্রযুক্তির উপর পোস্টার, লিফলেট, বুকলেট তৈরি করে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেন। আবার রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমেও কৃষিতথ্য প্রচার করেন। কৃষিতথ্য প্রচারের জন্য ‘কৃষিতথ্য সার্ভিস’ নামে একটি সংস্থা আছে। সম্প্রসারণ কর্মীরা কৃষকদের খামার ও গৃহ পরিদর্শন করেন। কৃষকদের সাথে সভা করেন। নতুন প্রযুক্তি বা পদ্ধতি প্রদর্শন করেন এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল প্রদর্শন করেন। এছাড়া তারা কৃষি মেলার আয়োজন করেন ও কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো, কৃষকেরা কৃষি সমস্যা নিজেরা চিহ্নিত করেন। যার কিছুটা সমাধান নিজেরা দিতে পারেন। যেসব সমস্যার সমাধান কৃষকেরা দিতে পারেন না, কেবল সেগুলো সম্পর্কে সম্প্রসারণ কর্মকর্তারা পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে কৃষক মাঠ স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। এ স্কুলের মাধ্যমে কৃষকদের সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

(গ) স্থানীয় কৃষি অফিস : বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় কৃষকদের সেবা প্রদানের জন্য কৃষি অফিস, প্রাণিসম্পদ অফিস, মৎস্য অফিস আছে। এসব অফিস দক্ষ কৃষিবিদ দ্বারা পরিচালিত। অফিসের তৃণমূল কর্মীরা কৃষকদের সাথে সভা করেন। সভায় কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং সমাধান দেওয়া হয়।



চিত্র : কৃষি মেলা

(ঘ) কৃষি মেলা : কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি, কৃষি উপকরণ ও উৎপাদিত কৃষিপণ্য একসাথে একমাত্র কৃষি মেলার মাধ্যমেই দেখা সম্ভব। আমের মতো শহরের এ ধরনের মেলার আয়োজন খুবই শুরুতপূর্ণ। এ মেলায় এক নজরে নানা ধরনের ফসল দেখা সম্ভব হয়। এই মেলায় চারা, বীজ, সার, কৃষি প্রযুক্তি ইত্যাদি দেখানো ও বিক্রি করা হয়। এ মেলায় কৃষিবিষয়ক নানা লিফলেট, পুস্তিকা, বুলেটিন, পত্রিকা প্রদর্শিত হয় এবং বিনামূল্যে দর্শকদের দেওয়া হয়। এতে কৃষি কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও উপস্থিত দর্শকগণও কৃষি কার্যক্রমে উন্মুক্ত হন। সুতরাং কৃষিবিষয়ক তথ্য পেতে কৃষি মেলার বিকল্প নেই।

কাজ : তোমাদের এলাকায় কৃষিবিষয়ক তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির উৎসগুলো দলগতভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

পাঠ-৪ : কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান

(ক) কৃষিশিক্ষা: বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃষিশিক্ষা দেওয়া হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনেক আগে থেকেই কৃষিশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদরাসা শিক্ষার সাথেও কৃষিশিক্ষা যুক্ত করা হয়েছে। কাছে গড়া শিক্ষার্থীরা শুক কৃষি জ্ঞান কৃষিকাজে ব্যবহার করে থাকেন। বাংলাদেশে ১৬টি কৃষি শিক্ষণ ইনসিটিউট আছে। এছাড়াও প্রাইভেট কৃষি শিক্ষণ ইনসিটিউট আছে। কারিগরি বোর্ডের একাডেমিক অধীনে থেকে ইনসিটিউটজগুলো ৪ বছর মেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা প্রদান করে থাকে। উচ্চতর কৃষিশিক্ষার জন্য বাংলাদেশে ৫টি সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। দুটি বিজ্ঞান ও শৈক্ষণিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ চালু আছে। কাছাকাছি রাজশাহী ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়েও কৃষি অনুষদ চালু আছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কৃষি অনুষদ হতে কৃষিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা দেওয়া হয়।

(খ) কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশে অনেকগুলো কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বেশিরভাগ গবেষণা প্রতিষ্ঠানই নির্দিষ্ট ক্ষসেলের উপরে গবেষণা করে থাকে। যেমন: বাংলাদেশে ধান গবেষণা ইনসিটিউট ধানের উন্নত জাত ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য গবেষণা করে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউট পাট উন্নয়নের জন্য শাবতীয় গবেষণা করে। বাংলাদেশ ইকু গবেষণা ইনসিটিউট ইকু উন্নয়নের জন্য শাবতীয় গবেষণা করে থাকে। বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট ও শরমাপুর গবেষণা ইনসিটিউট বিভিন্ন ক্ষসেলের উপর গবেষণা করে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমার্থী কৃষিবিদগণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে বোগদান করেন। তারা গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে নিজেকে নিয়েজিত রাখেন। ধীর ফলে কৃষকেরা উন্নতযানের ক্ষসেলের বীজ, নতুন জাত, রোগ ও কীটপতঙ্গের প্রতিকারিসহ নানা প্রযুক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন। ক্ষসল সম্পর্কিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ধানী ও মাছের উপর গবেষণার জন্য রয়েছে বাংলাদেশ প্রাপিসম্পদ গবেষণা ইনসিটিউট এবং যন্স্য গবেষণা ইনসিটিউট। এই গবেষণার ফলে ধানী পালন ও ধান চাষের অনেক প্রযুক্তি উন্নয়ন হয়েছে। এর ফলে প্রোটিম ব্যবসার ঘার উন্মুক্ত হয়েছে। সকল কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষণার ক্ষাক্ষল সম্পর্কিত লিফলেট, পুস্তিকা প্রকাশ করে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে।

(গ) কৃষি বিজ্ঞানী : কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যিনি গবেষণা করে নতুন নতুন জাত প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন, তিনি কৃষি বিজ্ঞানী। তিনি একটি ক্ষসেলের জীবনচক্র সুসংযোগে ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং তাঁর নিকট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা প্রকার তত্ত্ব পূর্ণীভূত থাকে। তাঁরা নতুন ক্ষসল ও ধানীর উন্নত জাত উৎপাদন ও সংরক্ষণ পক্ষতি উন্নয়ন করে দেশের কল্যাণ সাধন করছেন।



চিত্র: গবেষণা প্রতিষ্ঠান

কাজ: কৃষিক্ষেত্রে কৃষি গবেষণাগুলোর অবদান দলগতভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ: কৃষক মাঠ ক্ষেত্র, অভিজ্ঞ কৃষক, উন্নয়ন বৈচিত্রে, অনুষদ, কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষি মেলা।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ফসল উৎপাদন কর্মকাণ্ডের মূল বিষয় ।
২. মাছ প্রধান উৎস ।
৩. ডাল জাতীয় ফসল সরবরাহ করে ।

বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের	প্রায় ৫৬ গ্রাম ।
২. বর্তমানে দৈনিক মাথাপিছু মাছের চাহিদা	সার্বিক উন্নয়ন কৃষিনির্ভর ।
৩. আমিষের চাহিদার সিংহভাগ	আমরা মাছ থেকে পাই ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উদ্যান ফসল কাকে বলে?
২. কাদের দ্বারা মানুষের ঘোলিক চাহিদা পূরণ হয়?
৩. আমাদেরকে মাছে-ভাতে বাঞ্ছালি বলা হয় কেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. কৃষির পরিধি আলোচনা কর ।
২. কৃষি মেলা কৃষিবিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির উৎস - কথাটি বুবিয়ে লেখ ।
৩. পাঁচটি কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম ও এদের কাজ লেখ ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পাট গবেষণা ইনসিটিউট নিচের কোন ফসল নিয়ে গবেষণা করে?

- | | | | |
|----|-----|----|------|
| ক. | ধান | খ. | পাট |
| গ. | আখ | ঘ. | তুলা |

২. আমাদের দেশের কৃষির উন্নয়ন ঘটলে-
 - i. মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে
 - ii. দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটবে
 - iii. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১.



চিত্র : ক



চিত্র : খ

- ক. যাঠ ফসল কাকে বলে ?
 খ. কৃষি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে ? ব্যাখ্যা কর .
 গ. চিত্র 'ক' এর ফসলটি কোন ধরনের ? এর কারণ ব্যাখ্যা কর .
 ঘ. অর্থনৈতিক বিবেচনায় চিত্রের কোন ফসলটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ? এ সম্পর্কে তোমার মতামত তুলে ধর .

২। মীর হোসেন সাহেব তার বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, ফুল ও ফলের বাগান করেন।
 বিভিন্ন সময়ে নানাবিধি সমস্যায় পড়লেও উপযুক্ত পরামর্শের অভাবে বাগান থেকে ভালো ফল পাচ্ছিলেন না। গত বছর তার জেলা শহরে অনুষ্ঠিত কৃষি মেলায় গিয়ে কৃষিবিষয়ক বহু তথ্য বাস্তবে দেখেন ও পড়ার জন্য নিয়ে আসেন। এতে তার বাগানের উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সমাধান করেন। পরবর্তীতে তিনি প্রতিবেশীদের সাথে তার অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

- ক. কৃষিবিষয়ক একটি সমস্যার নাম লেখ।
 খ. অভিজ্ঞ কৃষকের জন্যই কৃষি চলমান আছে ব্যাখ্যা কর।
 গ. মীর হোসেন সাহেব মেলার অভিজ্ঞতা কীভাবে কাজে লাগিয়েছেন তা ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. মীর হোসেন সাহেবের প্রতিবেশীদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

বিতীয় অধ্যায়

কৃষি প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি

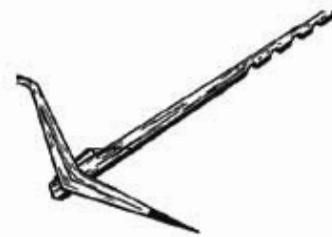
কৃষিকাজ করার জন্য যেসব ধারণা, পদ্ধতি, যন্ত্র বা জিনিসপত্র ব্যবহার করা হয়, সেগুলোই হচ্ছে কৃষি প্রযুক্তি। কৃষির যেমন বিভিন্ন শাখা আছে, তেমনি শাখাভিত্তিক প্রযুক্তিও উভাবন হচ্ছে। কতক্ষণে প্রযুক্তি আছে থাটিমকাল খেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আবার কতক্ষণে প্রযুক্তি আছে যা দশ বছর আগে হিল, এখন তার জারুরীর এসেছে নতুন প্রযুক্তি। সামুদ্র-জোড়াল গাটিন কৃষিবন্ধ হলেও বাংলাদেশে এর ব্যবহার এখনও চলছে। আবার মাঝা একটি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত হলেও এর জারণা এখন দখল করেছে আরও উচ্চ ফলনশীল ধানের অন্যান্য জাত। এভাবেই প্রযুক্তি উভাবন হতে থাকবে এবং ব্যবহার চলবে।



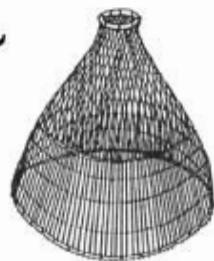
চিত্র : প্রাইভ



চিত্র : চাতো



চিত্র : দেশি পাতল



চিত্র : পত্তো

এই অধ্যায় পাঠ শেবে আমরা-

- কৃষি প্রযুক্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সহজলভ্য কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হানীয়ভাবে ধাগ্য ও সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে তৈরি প্রয়োজনীয় কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- কৃষি প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির অবদান উপরিক করতে পারব।

কৃষি প্রযুক্তির ধারণা ও ব্যবহার

পাঠ- ১ কৃষি প্রযুক্তির ধারণা

পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা আরও বেশি হারে বাড়ছে। বাড়তি মানুষের জন্য বাড়তি খাবার দরকার। আবার অন্যান্য কৃষিপণ্যেরও বেশি দরকার। এই বাড়তি চাহিদা পূরণের জন্য সব সময় মানুষ চিন্তা-ভাবনা করে আসছে। ফলে যুগে যুগে চাষাবাদের জন্য মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ভাবন করছে নতুন নতুন কৌশল বা প্রযুক্তি। তা হলে প্রযুক্তি কী? যখন মানুষ কৃষিকাজ শেখেনি তখন তারা পশু-পাখি শিকার করে মাংস খেত। বনজঙ্গল থেকে ফল-মূল কুড়িয়ে খেত। এক সময় তারা দেখল পশু-পাখি শিকার করে ও কুড়ানো ফল, মূলে তাদের ক্ষুধা মেটে না। তারা সমস্যায় পড়ে গেল। হঠাৎ তারা দেখল, মাটিতে বীজ পড়লে চারা বের হয়, গাছ বড় হয়, ফুল ও ফল হয়। আর এই ফল খাওয়া যায়। এভাবে তারা প্রথম প্রযুক্তি হিসেবে কৃষি উদ্ভাবন করল। অর্থাৎ তারা ফসল উৎপাদন শুরু করল। এরপর তারা বনের পশুদেরও পোষ মানিয়ে গৃহে পালনের কৌশল লাভ করল। এতে বোঝা গেল, ফসল উৎপাদন ও পশু পালন কৃষির আদি প্রযুক্তি।

আদি মানুষেরা ফসল উৎপাদন কীভাবে করত? এ জন্য আদি মানুষেরা চোখা কাঠি দিয়ে অল্প জায়গায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাটি আলগা করে ফসল ফলাত। তখন এই চোখা কাঠিই ছিল জমি চাষের উপযুক্ত প্রযুক্তি। চোখা কাঠির অল্প জমি চাষে যে ফসল ফলে তাতে মানুষের খাবারের চাহিদা পূরণ করতে পারতো না। প্রয়োজন হলো এমন এক প্রযুক্তি, যা দ্বারা অধিক জমি চাষ করা যায়। মানুষ গতীরভাবে চিন্তা করতে লাগল। চিন্তার ফসল হিসাবে উদ্ভাবন হলো কাঠের লাঙল, লোহার লাঙল, পাওয়ার টিলার, ট্রাস্টের ইত্যাদি।

কৃষি সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণালন্দ জ্ঞান ও কলাকৌশলকে কৃষি প্রযুক্তি বলা হয়। কৃষি প্রযুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো :

১. এর মধ্যে নতুনত্ব থাকবে ;
২. কৃষিকাজ সহজ করবে ;
৩. অধিক উৎপাদনের নিশ্চয়তা থাকবে ;
৪. খরচ কম কিন্তু লাভ বেশি হবে এবং
৫. সময় কম লাগবে।

কৃষি প্রযুক্তির বিষয়ভিত্তিক প্রকারভেদ

কৃষি এখন শুধু ফসল উৎপাদনের ব্যাপার নয়। শুধু পশু-পাখি পালনও নয়। কয়েকটি উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়ে কৃষির বিকাশ ঘটেছে। তেমনি প্রত্যেকটি উৎপাদন ক্ষেত্রের প্রযুক্তিও বিকাশ লাভ করেছে। ফসল উৎপাদন, পশু-পাখি পালন, মৎস্য চাষ, বনায়ন-এসব বিষয় নিয়েই কৃষি। কৃষির উন্নয়ন অর্থই হচ্ছে এসব বিষয়ের

সঠিক প্রযুক্তির উন্নাবন ও সঠিক ব্যবহার। অতএব নিচের ছকে কৃষির বিষয়ভিত্তিক কলাকৌশল বা প্রযুক্তির পরিচয় দেওয়া হলো :

কৃষি বিষয়	প্রযুক্তি
ফসল উৎপাদন	বিভিন্ন ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত, লবণ সহনশীল জাত, গোবর সার, জীবাণু সার, রাসায়নিক সার, সার ব্যবহারের মাত্রা, কীটনাশক, কীটনাশক ব্যবহারের মাত্রা, সাথী ফসল, সবুজ সার, পাওয়ার টিলার, লোলিফট পাম্প, গভীর নলকূপ, সেঁউতি, দোন ইত্যাদি ।
গৃহপালিত প্রাণী পালন	উন্নত জাতের গবাদি পশু, উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি, গরু মোটাতাজাকরণ, কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ, একত্রে হাঁস-মাছ-ধান চাষ, হাঁস-মুরগির সুষম খাদ্য, উন্নত পদ্ধতিতে বাচ্চা উৎপাদন, উন্নত পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণ, পশু-পাখির রোগ দমন ইত্যাদি ।
মৎস্য চাষ	খাঁচায় মাছ চাষ, মাছ ধরার বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন: পলো, জাল, বড়শি, পুকুরের পানি শোধন, তেলাপিয়া ও নাইলোটিকার চাষ, মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি ।
বনায়ন	সামাজিক বনায়ন, কৃষিবনায়ন, বৃক্ষ ও মাঠ ফসল চাষ পদ্ধতি, বনজ ও ফলদ উভিদ চাষ পদ্ধতি, বৃক্ষ ও গো-খাদ্য চাষ পদ্ধতি, চারা উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি ।

কাজ : বিষয়ভিত্তিক কৃষি প্রযুক্তিগুলো পোস্টার পেপারে উপস্থাপন কর ।

নতুন শব্দ : কৃষি প্রযুক্তি, ফসল উৎপাদন, গৃহপালিত প্রাণী পালন, জীবাণু সার, খাঁচায় মাছ চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ, সামাজিক বনায়ন ।

পাঠ- ২ : কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার

কৃষি প্রযুক্তি কৃষি কার্যক্রমকে অনেক সহজ করেছে । তাই কৃষি এখন লাভজনক পেশা । বর্তমানে কৃষকেরা দেশি লাঙ্গলের বদলে কলের লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করছেন । এতে কৃষকের অর্থ, সময় ও শ্রমের সাধারণ হচ্ছে । খাদ্যঘাটাটি বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা, উচ্চ ফলনশীল ধানের আবাদ করে কৃষকেরা এই ঘাটাটি পূরণের চেষ্টা করছেন । এছাড়া কৃষির কর্মকাণ্ডের জন্যই প্রযুক্তির উন্নাবন ঘটেছে যেমন: জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য জৈব সার, রাসায়নিক সার ও সবুজ সার ব্যবহার করা হচ্ছে । বীজ বপন, ফসল কাটা, ফসল মাড়াই-বাড়াই এর জন্য হস্ত ও শক্তি চালিত বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে । এসব প্রযুক্তি উন্নাবনের ফলে কৃষকেরা কৃষিকাজ অনেক সহজে করতে পারছেন ।

কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক। কৃষির প্রতিটি ক্ষেত্রে আবহমানকাল ধরেই কৃষকেরা কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছেন। দিন দিন কৃষকদের সমস্যা জটিল হচ্ছে আর কৃষি প্রযুক্তিগুলোও আধুনিক হচ্ছে। যেমন: কৃষকেরা জমি চাষে দেশি সাঞ্জেল ব্যবহার করেন। কিন্তু ইন্দো-ই মেশিনার্ডগ কৃষকই দেশি কাঠের সাঞ্জেলের পরিবর্তে পাওয়ার টিলার, ট্রান্স্ট ব্যবহার করছেন।

নিচে আরও কায়েকটি কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করা হলো:

১. বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপণ প্রযুক্তি :

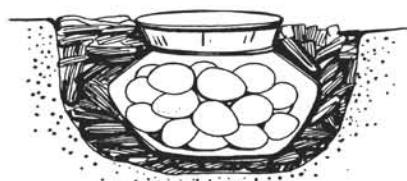
বসতবাড়ির চারপাশে সবাই বৃক্ষরোপণ করে। কিন্তু বসতবাড়ির কোন স্থানে কোন বৃক্ষটি রোপণ করা দরকার, তা অনেকেই জানেন না। বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপণের জন্য কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়। এসকল নিয়মাবলি মেনে বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপণ করলে বাড়িতে পর্যাপ্ত আলোবাতাস পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত জানতে পারব।



চিত্র : বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপণ

২. শূন্য চাষে ভূট্টা চাষ : জমি চাষ না করেও ভূট্টা চাষ করা যায়। বর্ষার পানি নেমে গেলে জমি কাদাময় থাকে। সেই জমিতে ভূট্টার বীজ রোপণ করলে ভালো ফলন হয়। এতে অর্থ আয় হয় এবং শুরু কর লাগে।

৩. মাটির ইঁড়িতে ডিম সংরক্ষণ : সাধারণত ডিম ৫-১০ দিনের বেশি ভালো থাকে না। ঘরের মেঝেতে গর্ত করে সেই গর্তে ইঁড়ি বসিয়ে ডিম রাখা হয়। গর্তে ইঁড়ির চারদিকে কাঠ কয়লা ঝেখে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে ডিম ঠাণ্ডা থাকে এবং ২০-২৫ দিন ডিম ভালো থাকে।



চিত্র : মাটির ইঁড়িতে ডিম সংরক্ষণ

কাজ : ‘বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই’ এ সম্পর্কে দলগত আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : মাটির হাঁড়িতে ডিম সংরক্ষণ, শূন্য চাষে ভুট্টা চাষ, বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপণ।

কৃষি যন্ত্রপাতির ধারণা ও ব্যবহার

পাঠ- ৩ : কৃষি যন্ত্রপাতির ধারণা

কৃষিকাজ একটি কারিগরি কাজ। কৃষির অধিকাংশ কাজই যন্ত্রের সাহায্যে করতে হয়। কৃষিকাজ একক কোনো কাজ নয়। এটা একটা প্রক্রিয়া, অনেকগুলো কাজের সমাহার। একটা কাজের সাথে আরেকটা কাজের ধারাবাহিকতা আছে। যেমন: জমি চাষ কৃষিকাজের শুরু আর ফসল মাড়াই-বাড়াই করে গোলাজাত করা কৃষিকাজের শেষ। জমি চাষ থেকে ফসল গোলাজাত পর্যন্ত সব কাজই যন্ত্রনির্ভর। কৃষিকাজ সম্পাদন করার জন্য যেসব যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তা-ই হচ্ছে কৃষি যন্ত্রপাতি।

বাংলাদেশের একদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে জমির পরিমাণ কমে আসছে। অন্ন জমি থেকে বেশি পরিমাণ ফসল উৎপাদন একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ জয়ের জন্য সঠিক যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার দরকার। শুধু ভালো বীজ, সার, পানি বা ঔষধ ব্যবহারই ফসল উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট নয়। পাশাপাশি কৃষি যন্ত্রপাতিরও দরকার। কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার যত সঠিক হবে, ফসল উৎপাদনও তত ভালো হবে।

জমিতে ফসল জন্মাতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুধু এখন নয়, প্রাচীন যুগেও ছিল। তখন কাঠের, হাড়ের বা পাথরের চোখা যন্ত্রের সাহায্যে মাটি খুঁড়ে আগাছা পরিষ্কার করে ফসলের বীজ বপন হতো। এরপর ত্রুমাসয়ে মানুষ ফসল উৎপাদনের কাজে গরু, মহিষ, ঘোড়া ও যান্ত্রিকশক্তি ব্যবহার করতে লাগল। কৃষিকাজ ভেদে এবং ফসল ভেদে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও ভিন্ন ভিন্ন।

ফসল উৎপাদনের কৃষিকাজগুলো হলো : জমি চাষ, বীজ বপন, চারা রোপণ, সার প্রয়োগ, আগাছা দমন, পোকামাকড় ও রোগ দমন, পানিসেচ দেওয়া, ফসল তোলা, মাড়াই-বাড়াই করা, শুকানো ও গোলাজাত করা। প্রত্যেকটি কাজের সাথেই যন্ত্রের ব্যবহার আছে।

যেসব যন্ত্র দ্বারা জমি চাষ, বীজ বপন, আগাছা দমন, পোকামাকড় দমন, পানি সেচ দেওয়া, ফসল তোলা, মাড়াই-বাড়াই করা হয় সেগুলোই কৃষি যন্ত্রপাতি। কৃষি যন্ত্রপাতিগুলোর কিছু হস্তচালিত, আর কিছু শক্তিচালিত।

কাজ : ১. তোমার এলাকায় যে কৃষিকাজ হয় তা লক্ষ কর এবং কাজগুলোর তালিকা তৈরি কর। অতঃপর তোমার পাঠে উন্নিখিত কাজগুলোর সাথে মিলাও।

২. কোন কাজের জন্য কোন যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয়, তার একটি তালিকা তৈরি কর এবং উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : কৃষি যন্ত্রপাতি, হস্তচালিত কৃষি যন্ত্রপাতি, শক্তিচালিত যন্ত্রপাতি।

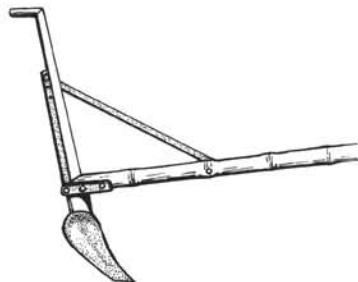
পাঠ- ৪ : হস্তচালিত উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার

হস্তচালিত কৃষি যন্ত্রপাতিগুলোকে কালক্রমে উন্নত করা হয়। নিচে হস্তচালিত উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির কয়েকটির ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

বারি লাঙ্গল

পুরো জমি প্রস্তুত করার জন্য দেশি লাঙ্গলের চেয়ে অর্ধেক সময়ের প্রয়োজন হয় এবং প্রথম চাষে কোনো জমি চাষ ছাড়া থাকে না। এর সুবিধা :

- ১। বারি লাঙ্গল মাটি কেটে উল্টে দেয়;
- ২। চাষের গভীরতা ও প্রশস্ততা দেশি লাঙ্গলের চেয়ে বেশি;
- ৩। শুকনা ও ভেজা উভয় প্রকার জমি চাষ করা যায়।

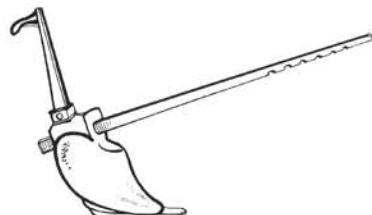


চিত্র : বারি লাঙ্গল

মোড় বোর্ড লাঙ্গল

মোড় বোর্ড লাঙ্গল দেশি লাঙ্গলের চেয়ে অধিকতর কার্যকর। এর সুবিধা :

- ১। এই লাঙ্গলের সকল অংশই লোহার তৈরি;
- ২। এই লাঙ্গল জমির মাটিকে আয়তাকার টুকরা করে চাষ করে এবং উল্টে দেয়।



চিত্র : মোড় বোর্ড লাঙ্গল

বারি বীজ বপন যন্ত্র

এটি একটি হাতে চালিত বীজ বপন যন্ত্র। এর সুবিধা :

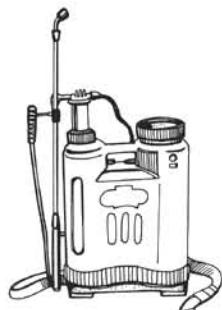
- ১। বীজ ঠিক দূরত্বে ও গভীরতায় বপন করা যায়;
- ২। এর দ্বারা বীজের অঙ্কুরোদগম ভালো হয় এবং
- ৩। বীজের পরিমাণ কম লাগে।



চিত্র : বারি বীজ বপন যন্ত্র

ঔষধ ছিটানো যন্ত্র : ন্যাগস্যাক স্পেঞ্জার

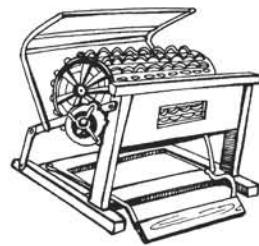
স্পেঞ্জার ফসলের রোগ ও পোকা দমনের কাজে ব্যবহার করা হয়। এতে পানি মিশ্রিত ঔষধ ভর্তি করে ট্রিগারের সাহায্যে নির্দিষ্ট উচ্চতায় ছিটানো হয়। স্পেঞ্জারের প্রধান প্রধান অংশ হচ্ছে : (১) নজল (২) ট্রিগার (৩) পাম্প করার বাল্ব (৪) ব্যারেল (৫) ঔষধ ছিটানোর নল।



চিত্র : ন্যাগস্যাক স্পেঞ্জার

প্যাডেল প্রেসার

এটি একটি উন্নত হস্তচালিত ধান বা গম মাড়াই যন্ত্র। এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে : টাইনযুক্ত একটি ড্রাম, ড্রামের সাথে যুক্ত একটি প্যাডেল। প্যাডেলের সাহায্যে ড্রামটিতে ঘূর্ণন সৃষ্টি করা হয় এবং যাতে ফসলের শীষ রাখলে টাইনের আধাতে শস্য মাড়াই হয়। এটি ধান বা গম মাড়াইয়ের কাজে ব্যবহার করা হয়। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি দ্বারা তৈরি করা হয়।



চিত্র : প্যাডেল প্রেসার

বারি পাম্প

বারি পাম্প একটি লোলিফট পাম্প। স্থানীয়ভাবে তৈরি করা যায়। এটি একটি আধুনিক সেচ প্রযুক্তি। এর সুবিধা:

- ১। অনেক বেশি পানি উঠানো যায়;
- ২। এটা দিল্লে মাটির নিচ এবং উপর থেকে পানি উঠানো যায়।



চিত্র : বারি পাম্প

কাজ : তোমার গ্রামের বাড়িতে যাও। দেখ হস্তচালিত উন্নত কৃষি যন্ত্রগুলো কৃষকেরা ব্যবহার করছেন কি না। যদি করেন, তবে এগুলো ব্যবহারের সুবিধাগুলো তোমার খাতায় লেখ।

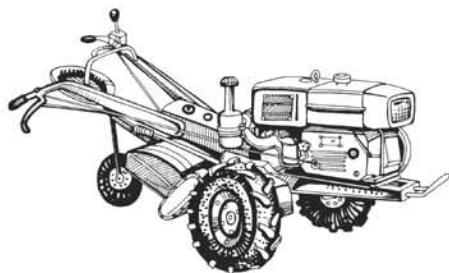
নতুন শব্দ : বারি লাঙ্গল, মোন্ট বোর্ড লাঙ্গল, বারি বীজ বপন যন্ত্র, প্যাডেল প্রেসার।

পাঠ- ৫ : শক্তিচালিত কৃষি যন্ত্রগাত্রির ব্যবহার

কৃষিকাজকে আরও সহজ করার জন্য শক্তিচালিত নানান কৃষি যন্ত্রগাত্রি উদ্ভাবন করা হয়েছে। নিচে কয়েকটি যন্ত্রগাত্রির ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

পাওয়ার টিলার

এর উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে ঘূর্ণি লাঙ্গল। চাষের সময় লাঙ্গলটি প্রচল গতিতে ঝোরে। আর তাতে গভীরভাবে জমি চাষ হয়। এতে মাটি ঝুরঝুরে হয় ও আগাছা ধৰণস হয়। ঘূর্ণি লাঙ্গল চালাতে সুবিধা হলো, এর সাথে চাকতি বা ফালি লাঙ্গল ও রোটারি লাঙ্গল ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। পাওয়ার টিলার দ্বারা দ্রুত ও গভীরভাবে জমি চাষ করা হয়।

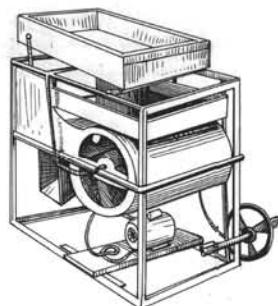


চিত্র : পাওয়ার টিলার

বারি শস্য ঝাড়াই যন্ত্র

বারি শস্য ঝাড়াই যন্ত্র ব্যবহারে নিরোক্ত সুবিধাগুলো পাওয়া যায় :

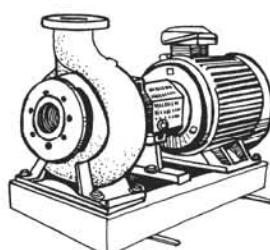
- ১। ঘরের ভিতর খারাপ আবহাওয়ায় ব্যবহার করা যায়;
- ২। অল্প সময়ে ও অল্প খরচে ঝাড়াই ও পরিষ্কার করা যায়;
- ৩। এটা চালানো সহজ।



চিত্র : বারি শস্য ঝাড়াই যন্ত্র

সেক্ট্রিফিউগাল পাম্প

এটি শক্তিচালিত সেচব্যন্তি। এর সাহায্যে লোলিফট পাম্প, অগভীর নলকূপ ও গভীর নলকূপ চালানো হয়। লোলিফট পাম্প দ্বারা নদী বা ধান-বিল হতে আর অগভীর বা গভীর নলকূপ দ্বারা মাটির নিচ থেকে পানি উত্তোলন করে ফসলের মাঠে সেচ দেওয়া হয়।



চিত্র : সেক্ট্রিফিউগাল পাম্প

সেক্ট্রিফিউগাল পাম্পের সুবিধা

- ১। সহজে পানি তুলে সেচ দেওয়া যায়;
- ২। অশ্বশক্তির মাঝায় পানি উঠে;
- ৩। প্রয়োজন অনুযায়ী চালানো যায়।

বারি শস্য মাড়াই যন্ত্র

বারি শস্য মাড়াই যন্ত্র একটি আধুনিক মাড়াই প্রযুক্তি। এর দ্বারা বিভিন্ন রকমের ফসল মাড়াই করা যায়। এর ক্ষমতা প্যাডেল ফ্রেসারের চেয়ে বেশি। এর সুবিধা-



- ১। বারি শস্য মাড়াই যন্ত্র দিয়ে ধান, গম ও ডাল মাড়াই করা যায়;
- ২। কম আর্দ্ধতার ফসল হলে যন্ত্রটি ভালো কাজ করে।

চিত্র : বারি শস্য মাড়াই যন্ত্র

কাজ : কৃষকেরা যেসব শক্তিচালিত কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন, এর একটা তালিকা তৈরি কর। কোন কোন যন্ত্রপাতির নাম এই পাঠে উল্লেখ করা হয়নি তা লেখ।

নতুন শব্দ : পাওয়ার টিলার, বারি শস্য মাড়াই যন্ত্র, বারি শস্য মাড়াই যন্ত্র, সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প।

সহজলভ্য কৃষি প্রযুক্তি

পাঠ- ৬ ভালো বীজ বাছাইকরণ

ভালো বীজে ভালো ফসল। অর্থাৎ শুণগত মানসম্পন্ন বীজ থেকেই ভালো ফসল জন্মায়। প্রবাদ আছে যে ‘সুবৎশে সুসন্তান সুধীজনে কর’

ভালো বীজে ভালো ফসল জানিবে নিশ্চয়।

ফসল উৎপাদনে ভালো বীজের গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক সময় ভালো বা উন্নত জাতের বীজ হলেও নানা কারণে বীজ ভালো হয় না। বীজে অনেক কিছু থাকতে পারে, যা উন্নত জাতের বীজকেও নির্গুণ করে দেয়।

ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য

- ১। অন্য জাতের মিশ্রণযুক্ত থাকতে হবে।
- ২। বীজ পরিকার ও পুষ্ট হবে।
- ৩। বীজের রং স্বাভাবিক হবে।
- ৪। বীজ দাগযুক্ত বা পোকা খাওয়া বা ভাঙা হবে না।
- ৫। ইট, পাথরের কণা ও আগাছা থেকে বীজ মুক্ত হবে।
- ৬। বীজ অঙ্গুরোদ্গমের শতকরা হার কম পক্ষে ৮০ ভাগ হবে।

ভালো বীজ পেতে হলে নীরোগ ও পোকামুক্ত জমি হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। ভালো করে ফসল কাটার পর পরিচ্ছন্নভাবে মাড়াই-বাড়াই করে বীজকে অন্যজাতের বীজ, ইট-পাথরকণা, আগাছার বীজ, চিটা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করতে হবে। তারপরও বীজে ভেজাল থাকতে পারে। তাই বীজ বাছাই করা একান্ত প্রয়োজন।

বীজ বাছাইকরণ পদ্ধতি

নিম্নলিখিতভাবে বীজ বাছাই করা যায়

ক) বীজ বাছাইয়ের উপকরণ নির্বাচন

১. ১টি চিমটা, ১টি আতশ কাচ, ১ তা সাদা কাগজ ও ১টি ছেট নিঙ্কি
২. নির্দিষ্ট ফসলের বীজ

খ) বীজের পরিমাণ

১. ছেট বীজ ১০ গ্রাম
২. মাঝারি বীজ ৫০ গ্রাম
৩. ধান বা গম আকারের বীজ ১০০ গ্রাম

গ) কাজের ধাপ

১. ১০০ গ্রাম ধানের বীজ গুগে নাও।
২. সাদা কাগজে ধানের বীজগুলো রাখ।
৩. বীজগুলো হতে নিম্নলিখিত বস্তুগুলো অপসারণ কর

- অন্য জাতের বীজ
- ভাঙা বা পোকা খাওয়া বীজ
- অপুষ্ট বীজ
- আগাছার বীজ
- জড় পদার্থ

৪. এখন বাছাইকৃত বীজ ও অপসারিত বস্তু আলাদাভাবে ওজন কর এবং বাছাইকৃত বীজের শতকরা হার বের কর।

$$৫. \text{সূত্র: } \text{বাছাইকৃত বীজের শতকরা হার} = \frac{\text{মোট বীজের ওজন} - \text{অপসারিত বস্তুর ওজন}}{\text{মোট বীজের ওজন}} \times 100$$

বাছাইকৃত বীজের শতকরা হার যত বেশি হবে বীজ তত ভালো হবে, অর্থাৎ বীজ তত বিশুद্ধ হবে। এভাবে আমরা বীজের বিশুদ্ধতার হার নির্ণয় করে ভালো বীজ চিনতে পারি।

নতুন শব্দ : বীজ বাছাইকরণ, বীজের আর্দ্রতা, বীজ বাছাই উপকরণ

পাঠ- ৭ : কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ

শুকনা মৌসুমে গো-খাদ্যের অভাব ঘটে। তাই বর্ষাকালে যখন ঘাস প্রচুর জন্মে, তখনই শুকনা মৌসুমের জন্য গো-খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। এ জন্য কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ পদ্ধতিকে সাইলেজ বলা হয়। এতে ঘাসের পুষ্টিমানের কোনো পরিবর্তন হয় না। যে নির্দিষ্ট স্থানে বা গর্তে ঘাস সংরক্ষণ করা হয়, তাকে বলা হয় সাইলোপিট। সাইলোপিটে বায়ুরোধক অবস্থা তৈরি করতে হয়। বায়ুরোধক অবস্থায় ঘাসে ল্যাকটিক এসিড তৈরি হয়। এই ল্যাকটিক এসিড কাঁচা ঘাস সংরক্ষণে কাজ করে।

কাঁচা ঘাসের গুরুত্ব অনেক। শীতকালে অনেক স্থানেই ঘাসের অভাব দেখা দেয়। তখন পশুকে মানসমত খাবার প্রদান কঠিকর হয়। তাই বর্ষাকালে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করে গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব প্ররুণ করা যায়। সাইলেজের গুণাগুণ কাঁচা ঘাসের মতো। কাঁচা ঘাসের গুণসম্পন্ন সাইলেজে গবাদি পশুর দুধ উৎপাদন বাড়ে।

যেসব ঘাসে কার্বোহাইড্রেট বেশি থাকে, সেসব ঘাস সাইলেজের জন্য ভালো। কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ বা সাইলেজের জন্য উন্নত জাতের কাঁচা ঘাস যেমন: প্যারা, নেপিয়ার, জার্মান, গিনি, ভুট্টা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। তবে ভুট্টার সাইলেজ অনেক ভালো। কাঁচা ধানের খড় ও কাঁচা ঘাস ১:৫ অনুপাতে মিশিয়ে সাইলেজ তৈরি করা যেতে পারে।

সাইলোপিট তৈরির স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমন স্থানে সাইলোপিট তৈরি করতে হবে, যেখানে বৃষ্টির পানি জমে থাকে না এবং ঘাসের অভাব হয় না। সাইলোপিট কাঁচা-পাকা দুইই হতে পারে। নিচে কাঁচা পিটে সাইলেজ তৈরির পদ্ধতি আলোচনা করা হলো:

১. কাঁচা ঘাস সংরক্ষণের জন্য প্রথমেই শুকনা ও উচু জায়গা নির্ধারণ করতে হবে।
২. নির্ধারিত স্থানে ১ মিটার গভীর, ১ মিটার প্রস্থ এবং ১ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি গর্ত তৈরি করতে হবে।
৩. ১ ঘন মিটার একটি মাটির গর্তে প্রায় ৭০০ কেজি কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করা যায়।
৪. কাঁচা ঘাসের শতকরা ৩-৪ ভাগ চিটাগুড় মেপে একটি চাড়িতে নিতে হবে।
৫. এরপর চিটাগুড়ের সাথে সম্পরিমাণ পানি মিশাতে হবে।
৬. গর্তের তলায় পলিথিন বিছালে ভালো হয়। পলিথিন না বিছালে পুরু করে খড় বিছাতে হবে এবং চারপাশে ঘাস সাজানোর সাথে সাথে খড়ের আস্তরণ দিতে হবে।
৭. এরপর ধাপে ধাপে ৭০০ কেজি কাঁচা ঘাস দিয়ে ২০-৩০ কেজি শুকনা খড় দিতে হবে।
৮. প্রতিটি ঘাসের ধাপে ১৫ থেকে ২০ কেজি চিটাগুড়-পানির মিশ্রণ সম্ভাবে ছিটাতে হবে।
৯. এভাবে ধাপে ধাপে ঘাস ও খড় বিছিয়ে ভালোভাবে পা দিয়ে পাড়াতে হবে, যাতে বাতাস বেরিয়ে যায়।
১০. ঘাস সাজানো শেষ হলে খড়ের আস্তরণ দিয়ে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
১১. সর্বশেষে পলিথিনের উপর ৭.৫ - ১০ সেমি মাটি পুরু করে দিতে হবে।

আকালের সময় (অক্টোবর-নভেম্বর) সংরক্ষিত কাঁচা ঘাস বা সাইলেজ গরুকে খেতে দিতে হবে। পিটের একদিক থেকে শুরু করে ক্রমায়ে ঘাস বের করতে হবে। এর স্বাদ ও গন্ধ ভালো হওয়ায় গবাদি পশুরা এভাবে সংরক্ষিত কাঁচা ঘাস খেতে খুবই পছন্দ করে।

কাজ : উল্লিখিত বর্ণনা মোতাবেক কাঁচা ঘাস সংরক্ষণের জন্য তোমরা দলবদ্ধ হয়ে ৫০ সে মি গভীর, ৫০ সে মি প্রস্থ এবং ৫০ সে মি দৈর্ঘ্যের একটি গর্ত তৈরি কর। গর্তে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ কর।

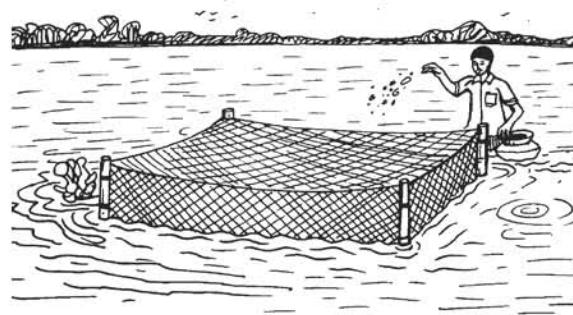
নতুন শব্দ : সাইলেজ, কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ, সাইলোপিট, চিটাগুড়, কার্বোহাইড্রেট, নেপিয়ার, প্যারা, গিনি।

পাঠ- ৮ : খাঁচায় মাছ চাষ

দেশের জনসংখ্যা বাড়ার কারণে মাছের চাহিদাও অনেক বেড়েছে। বিভিন্ন কারণে বাজারে মাছের সরবরাহ কমে যাচ্ছে। মাছের চাহিদা পূরণের জন্য মৎস্য বিশেষজ্ঞরা মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অনেক পরামর্শের মধ্যে খাঁচায় মাছের চাষ একটি। বর্তমানে মুক্ত জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। খাঁচায় মাছের চাষ আমাদের দেশে নতুন হলেও উত্তর আমেরিকায় অনেক আগে থেকেই এর ব্যবহার চলে এসেছে। ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশেও এর প্রচলন আছে।

বাংলাদেশে খাঁচায় মাছ চাষ মৎস্য বিশেষজ্ঞদের একটি অনুমোদিত প্রযুক্তি। যেসব এলাকায় নদী-নালা, হাওর, খাল-বিল আছে সেসব এলাকার কৃষকেরা এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে পারেন। নদীতে বা বিলে বা যে কোনো উন্মুক্ত জলাশয়ে খাঁচা বানিয়ে পুরুরের আকার দেওয়া যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, খাঁচায় মাছের চাষ করে একদিকে পারিবাসিক পুষ্টির চাহিদা মেটানো যায়, অপরদিকে এই মাছ বাজারে বিক্রি করে অর্থ লাভ করা যায়।

খাঁচা তৈরির প্রথমেই চারদিকে চারটি খুঁটি দিয়ে এবং আড়াআড়ি বাঁশ বেঁধে খাঁচার আয়তাকার কাঠামো তৈরি করা হয়। এরপর খাঁচার কাঠামোর চারদিকে এবং উপরে-নিচে জাল দ্বারা আবৃত করে খাঁচা তৈরি করা হয়। পরে খাঁচাটি তুলে নদীতে বা হাওরে নিয়ে মাটিতে শক্ত করে বাঁশের খুঁটি পুঁতে এর সাথে বেঁধে দিতে হয়। খাঁচার উপরের দিকে মাছের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়। খাঁচা ছেট, মাঝারি ও বড় হতে পারে। ছেট আকারের খাঁচার মাপ হচ্ছে দৈর্ঘ্য ৩ মিটার, প্রস্থ ২ মিটার এবং গভীরতা ২ মিটার। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মাছ চাষের জন্য খাঁচার আকার এর চেয়েও দ্বিগুণ বা তিনগুণ আকারের হতে পারে। মাছের খাঁচা যে শুধু আয়তাকার হবে তা নয়। আবার গোলাকারও হতে পারে। লম্বা বাঁশের ফ্রেম বানিয়ে এর সাথে ঘন ছিদ্রযুক্ত নেট বা জাল লাগিয়ে অনেকগুলো খোপের মাছের খাঁচা তৈরি করা যায়। বিভিন্ন খোপে বিভিন্ন মাছের চাষ করা যেতে পারে।



চিত্র : খাঁচায় মাছ চাষ

স্রোতহীন বা কম স্রোতের পানিতে খাঁচা বসাতে হবে। বেশি স্রোতে খাঁচার ব্যবস্থাপনা কঠিন ও ব্যয়সাধাৰ। খাঁচা খুঁটি বা প্লাটফর্ম দ্বারা বসাতে হবে। খুঁটির চেয়ে প্লাটফর্ম বেশি ভালো। তেলের ড্রাই দ্বারা প্লাটফর্ম তৈরি করা যায়। প্লাটফর্ম ব্যবহার করলে যেকোনো গভীরতায় খাঁচা বসানো যায়।

খাঁচায় মাছের চাষ হলো নিবিড় চাষ। এ জন্য সুষম খাদ্য অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশে খাঁচায় তেলাপিয়া, নাইলোটিকা ও কার্গ জাতীয় মাছ চাষ করা যায়। খাঁচা বড় হলে পাইস মাছও চাষ করা যায়। তবে এদের মাঝে তেলাপিয়ার চাষ লাভজনক। তেলাপিয়া চাষ করতে হলে প্রতি ১ ষন্টিমিটার খাঁচায় ২০০-৩০০ গোনা ছাড়তে হবে। গমের ভূসি ও ফিশমিল যথাক্রমে ৮৫% ও ১৫% হারে মিশিয়ে মাছকে খাদ্য হিসাবে দিতে হবে। প্রতিদিন খাদ্যের পরিমাণ থাকবে মাছের দেহের ওজনের ৬-৭%। খাঁচার তলার সবটুকু অংশ পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে তাতে খাদ্য দিতে হবে।

খাঁচার জাল পলি ও শেওলায় ভর্তি হয়ে যেতে পারে। এমন হলে যথাসময়ে ত্রাশ বা বাঁশের শলার ঝাঁটা দিয়ে জাল পরিষ্কার করতে হবে। প্রতি ৩ মাস অন্তর একটি ১ ষন্টিমিটার খাঁচা হতে ২০ কেজি তেলাপিয়া উৎপাদন করা সম্ভব।

নতুন শব্দ : খাঁচায় মাছ চাষ, মৎস্য বিশেষজ্ঞ, প্লাটফর্ম, ফিশমিল।

স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতির ধারণা ও ব্যবহার

স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতি সবার কাছেই পরিচিত। প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়িতেই এই স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতিগুলো দেখা যায়। স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে জমি চারের যন্ত্রপাতি যেমন: দেশি লাঙ্গল, জোয়াল, মই ও কোদাল প্রধান। পঙ্গোলন যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে মুরগির খাবার পাত্র ও পানির পাত্র প্রধান। আবার মাছ ধরার যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে পলো, বড়শি ও জাল প্রধান।

পাঠ- ৯ : ফসল উৎপাদনের স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতি ও ব্যবহার

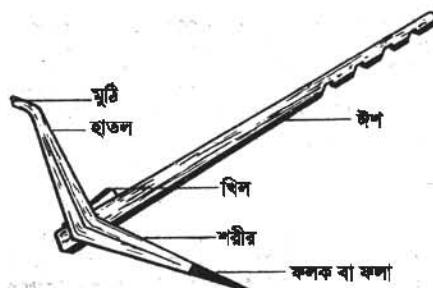
ফসল উৎপাদনের জন্য স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে লাঙ্গল, জোয়াল, মই ও কোদাল প্রধান। নিচে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো :

লাঙ্গল : লাঙ্গল দেশি লাঙ্গল হিসাবেই অধিক পরিচিত। একটি কাঠকে বাঁকা করে কাঠের আগায় লোহার একটি ফলক বা ফাল লাগানো হয়। এই ফলকের সাহায্যেই লাঙ্গল মাটি চিরে জমি চেবে। লাঙ্গলের উপরের অংশকে বলা হয় হাতল। এই হাতল ঢেপে ধরেই কৃষকেরা জমিতে লাঙ্গল চালনা করেন।

লাঙ্গলের মধ্যস্থানে একটি ছিদ্র করা হয়। এই ছিদ্রপথে প্রায় ৮ ফুট লম্বা একটি কাঠ যুক্ত করা হয়, যার আগায় ৪-৫টি দাঁত বা খাঁজ কাটা থাকে। এটাকে ইশ বলা হয়। ইশের খাঁজে রশি বেঁধে জোয়ালের সাথে লাঙ্গল লাগানো হয়। ইশ যাতে লাঙ্গলের সাথে ভালোভাবে আবক্ষ থাকে সেজন্য ছেট কাঠের একটি খিল ব্যবহার করা হয়।

লাঙ্গল ব্যবহারের সুবিধা

- ১। লাঙ্গল সহজলভ্য;
- ২। লাঙ্গল তৈরি করা ও পরিচালনা সহজ;
- ৩। লাঙ্গল ওজনে হালকা বলে বহন করা সহজ।

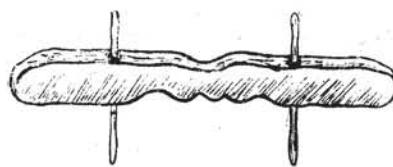


চিত্র: দেশি লাঙ্গল

জোয়াল : জোয়াল হালের গরুর কাঁধে স্থাপন করে লাঙ্গলের সাথে যুক্ত করা হয়। জোয়ালের দুই প্রান্তে দুটি ছিদ্র করা হয়। ছিদ্রপথে ছিদ্রের মাপ অনুযায়ী দুটি শক্ত কাঠি লাগানো হয়। জোয়াল গরুর কাঁধে রেখে কাঠি দুটির সাথে রশি বেঁধে লাঙ্গলের সাথে জোড়া হয়।

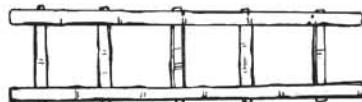
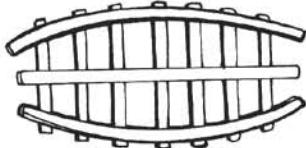
জোয়ালের সুবিধা

- ১। বাঁশ বা কাঠ দিয়ে জোয়াল তৈরি করা যায়;
- ২। জোয়াল তৈরি করা সহজ;
- ৩। ওজনে হালকা।



চিত্র : জোয়াল

মই : মই প্রধানত বাঁশ বা কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয়। মোটা একটি বাঁশকে সমালিখি ফালি করে দুই ভাগ করা হয়। অনেক মইয়ে তিনটি ফালি ব্যবহার করা হয়। এক জোড়া গরু হলে লস্বা হবে ৫ ফুট এবং দুই জোড়া গরু হলে লস্বা হবে সাড়ে সাত ফুট। মইয়ের কাজ হলো :



চিত্র : মই

- ১। মাটির চেলা ভাঙা;
- ২। মাটি সমতল করা;
- ৩। আগাছা দমন ও আলগাদা করা;
- ৪। বীজের অঙ্কুরোদগম সহজ করা।

কোদাল : কোদাল কৃষিকাজের একটি অতিপরিচিত যন্ত্র। জমির কোনা বা আইল যেখানে লাঞ্জের ফলা স্পর্শ করে না তা কোদাল দিয়ে চাষ করা হয়। এছাড়া ছোট ছোট পুটে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে সবজি চাষ করা হয়। কোদাল দ্বারা গর্ত করে ফলের চামা লাগানো হয়। কোদাল লোহার পাত দ্বারা তৈরি। লোহার পাত মুখের দিকে ২০ সেমি প্রস্থ হয় এবং ২৮ সেমি লস্বা হয়। পায় তিন ফুট লস্বা কাঠের হাতল লাগানো হয়।

কোদালের সুবিধা :

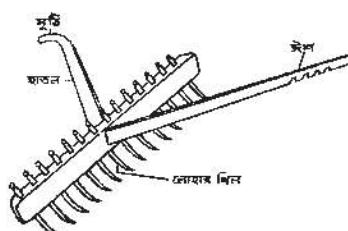
- ১। স্থানীয়ভাবে কামারশালায় তৈরি করা যায়;
- ২। মাটি আলগা করা, চেলা ভাঙা ও আগাছা দমনেও কোদাল ব্যবহার করা যায়।



চিত্র : কোদাল

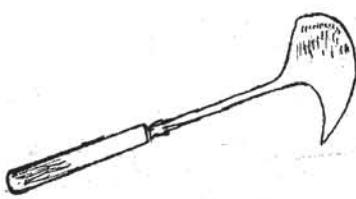
আঁচড়া বা বিদা : আঁচড়া বা বিদা কাঠ ও বাঁশ বা লোহার খিল দিয়ে তৈরি করা হয়। আঁচড়ার ১.৫ মি. লস্বা একটি দড় থাকে। এই দড়ে ১০ সেমি পরপর ছিদ্র থাকে। ছিদ্রগথে বাঁশের বা লোহার খিল লাগানো হয়। এতে হাতল ও ঈশ লাগানো হয়। আঁচড়ার প্রধান কাজ হলো :

- ১। ফসল পাতলা করা;
- ২। আগাছা দমন করা;
- ৩। মাটি আলগা করা।



চিত্র : আঁচড়া বা বিদা

নিড়ানি : ফসলের জমি হতে আগাছা পরিষ্কার ও মাটি আলগা করার কাজে নিড়ানি ব্যবহার করা হয়। এর আগার দিক অর্ধ-চন্দ্র আকৃতির লোহার পাত দিয়ে তৈরি করা হয়। আর গোড়ার দিকে সরু হয় এবং কাঠের বাঁট লাগানো হয়।



চিত্র : নিড়ানি

কাজ : তোমাদের বাড়িতে যেসব কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় এর তালিকা তৈরি কর। তৈরি তালিকার সাথে এই পাঠে উল্লিখিত যন্ত্রগুলোর নাম মিলাও।

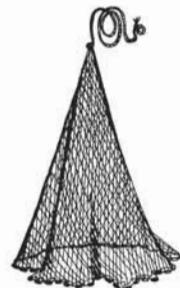
নতুন শব্দ : লাঙ্গল, জোয়াল, আঁচড়া, নিঢ়ানি, ইশ।

পাঠ- ১০ : মাছ ধরার হালীয় যন্ত্রপাতি ও ব্যবহার

হালীয়ভাবে মাছ ধরার অনেক যন্ত্রপাতি আছে। তন্মধ্যে জাল, পলো ও বড়শি প্রধান। প্রায় কৃষকের ঘরেই বিভিন্ন রূক্ষ জাল, পলো, বড়শি দেখতে পাওয়া যায়।

১। **জাল :** জাল এদেশের প্রাচীন মাছ ধরার কৌশল। জাল সূতা দ্বারা তৈরি করা হয়। পুরু, ডোবা, নদী-নালা, খাল-বিল, এমনকি সমুদ্র থেকেও জাল দ্বারা মাছ ধরা হয়। পানিতে জাল পাতলে বা জাল ফেললে জালের ফাঁসে মাছ আটকা পড়ে। কৃষকেরা বিভিন্ন ধরনের জাল ব্যবহার করেন। যেমন: ঝাঁকি জাল, টেলা জাল এবং খরা জাল।

ক) ঝাঁকি জাল : ঝাঁকি জালের উপরের প্রান্তে সরু রশি বাঁধা থাকে। জালের নিচের দিকে লোহার ছোট ছোট কাটি যুক্ত করা হয়, যাতে পানিতে জাল ফেললে তাড়াতাড়ি দুবে যেতে পারে। মাছ ধরার সময় খাল, পুরু বা নদীর তীর থেকে রশিটি হাতে রেখে জাল পানিতে ছুড়ে মারা হয়। পরে রশি ধরে টেনে জাল তোলা হয়। জালের নিচে অনেক ধরনের মাছ আটকা পড়ে। পুটি, চিংড়ি, কার্প ও নলা মাছ বেশি ধরা পড়ে।



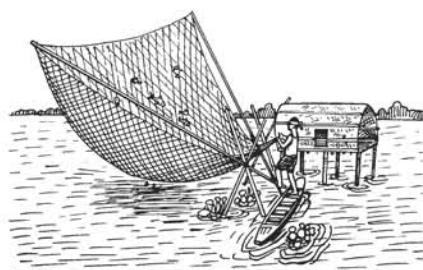
চিত্র : ঝাঁকি জাল

খ) টেলা জাল : টেলা জাল তিন কোণ। এটাকে তিন কোণ বাঁশের ফ্রেমে আটকানো হয়। টেলা জাল দিয়ে সাধারণত ছোট ছোট মাছ ধরা হয়। টেলা জালের হাতল ধরে পানিতে নেমে সামনের দিকে নিলে এই জালে পুটি, খলিসা, চিংড়ি, বেলে ইত্যাদি মাছ ধরা পড়ে।



চিত্র : টেলা জাল

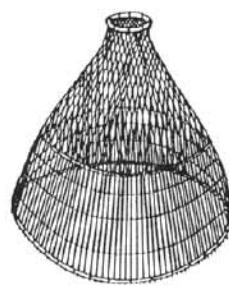
গ) খরা জাল : এটি একটি বিভুজাকৃতির জাল যা বাঁশের মাচা বা টৎ থেকে চালানো হয়। জাল ইংরেজী “V” আকৃতির বাঁশের কাঠামোর মাঝখানে বাঁধা থাকে। জালটি নদী বা বিলে মাছের চলাচলের পথে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়। একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর জালের পিছনের দিকে বাঁশের গোড়ায় চাপ দিলে জাল উপরে উঠে আসে। এর পর জালে আটকা পড়া মাছ সংগ্রহ করা হয়।



চিত্র : খরা জাল

২। পলো : পলো মাছ ধরার একটি প্রাচীন পদ্ধতি। এটি বাঁশের শলাকা ও বেত দিয়ে তৈরি। এর নিচের দিকের মুখ গোলাকার ও বড় এবং উপরের দিকের মুখও গোলাকার কিন্তু ছোট। দুই মুখই খোলা থাকে।

পলো উপরের দিকে হাত দিয়ে ধরে অগভীর পানিতে চাপ দিতে হয়। মাছ পলোতে আটকা পড়লে পলোর ভিতরে ছুটাছুটি বরতে থাকে। অতঃপর উপরের মুখ দিয়ে হাত চুকিয়ে পলোর ভিতর থেকে মাছ ধরা হয়। শোল, গজার ইত্যাদি বড় মাছ পলোতে ধরা পড়ে।



চিত্র : পলো

৩। বড়শি : বড়শি লোহার তৈরি। বড়শির জন্য প্রায় ২০০ সেমি লম্বা একটি ছিপ দরকার পড়ে। হাটে-বাজারে এমনকি শহরেও মাছ ধরার জন্য বিশেষ ধরনের ছিপ পাওয়া যায়। ছিপের আগায় সুতার এক প্রান্ত বেঁধে অপর প্রান্ত বড়শির সাথে বাঁধা হয়।



চিত্র : বড়শি

বড়শিতে বিভিন্ন ধরনের টোপ লাগিয়ে পানিতে ফেলা হয়। মাছ টোপ দেখে খাওয়ার সময় বড়শিতে আটকা পড়ে। তারপর সুতাটি টেনে বড়শি থেকে মাছ সংগ্রহ করা হয়। বড়শি অনেক প্রকারের। ছোট পুটি মাছ থেকে শুরু করে বৃহৎ বোয়াল মাছও বড়শিতে আটকা পড়ে।

কাজ : তোমার এলাকাবাসী কী কী যন্ত্র দ্বারা মাছ ধরেন এর একটা তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : বাঁকি জাল, চেলা জাল, খরা জাল, পলো।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. কৃষি যন্ত্রপাতি.....প্রকার।
২. পাওয়ার টিলার দ্বারা.....জমি চাষ হয়।
৩. পলোধরার একটি প্রাচীন পদ্ধতি।

বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. লাঙল	ডিম সংরক্ষণ।
২. আগাছা	জাল।
৩. প্যাডেল খ্রেসার	নিড়ানি।
৪. মাছ	জমি চাষ।
৫. মাটির ইঁড়ি	মাড়াই যন্ত্র।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কৃষি প্রযুক্তি কাকে বলে?
২. পাঁচটি কৃষি যন্ত্রপাতির নাম লেখ।
৩. লাঙল ব্যবহারের সুবিধা লেখ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. জমি চাষের জন্য লাঙলের যে ধারাবাহিক পরিবর্তন এসেছে তা বর্ণনা কর।
২. খাঁচায় মাছ চাষ একটি কৃষি প্রযুক্তি-কথাটি ব্যাখ্যা কর।
৩. কঁচা ঘাস সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি ফসল মাড়াই যন্ত্র?

ক.	পাওয়ার টিলার	খ.	প্যাডেল খ্রেসার
গ.	ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার	ঘ.	সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প
২. ভালো বীজে গজানোর হার কমপক্ষে শতকরা কত ভাগ?

ক.	৫০ ভাগ	খ.	৬০ ভাগ
গ.	৭০ ভাগ	ঘ.	৮০ ভাগ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উভয় দাও

মমতাজ মিয়া তার দুঃখ খামারে সবুজ ঘাসের অভাব মিটানোর জন্য প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শে
সাইলেজ প্রস্তুত করে রাখলেন।

৩. মমতাজ মিয়া কোন খুতুতে সাইলেজ প্রস্তুত করে রাখলেন।

- | | | | |
|----|-----------|----|--------|
| ক. | বর্ষাকাল | খ. | শরৎকাল |
| গ. | হেমন্তকাল | ঘ. | শীতকাল |

৪. সাইলেজ প্রস্তুতের ফলে মমতাজ মিয়ার খামারে-

- i. সারা বছর সুষম খাদ্য সরবরাহ হবে
- ii. কাঁচা ঘাসের অপচয় রোধ হবে
- iii. খামারের খরচ কমে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

৫. ফসলের পোকামাকড় দমনের জন্য ব্যবহৃত কৃষি উপকরণ কোনটি?

- | | | | |
|----|-----------------------|----|-----------|
| ক. | নিড়ানি | খ. | আঁচড়া |
| গ. | ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার | ঘ. | বারিপাম্প |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. কাশিমপুর গ্রাম একটি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর গ্রাম। এখানকার কৃষকরা কৃষিকাজে
যন্ত্রনির্ভর। তাদের ফসলের ফলন পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। কৃষি কর্মকর্তা
রাসেল সাহেব পার্শ্ববর্তী হরিপুর গ্রামের কৃষকদের কাশিমপুর গ্রামের মতো আধুনিক কৃষি
প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য উন্নুন্দ করেন। তিনি হরিপুরের কৃষকদেরকে উঠোন বৈঠকের মাধ্যমে
পরামর্শ প্রদান করেন এবং কাশিমপুর গ্রামের কৃষকদের কার্যক্রম সরেজমিনে দেখাতে নিয়ে
যান।

- ক. কৃষি প্রযুক্তি কাকে বলে?
- খ. আধুনিক প্রযুক্তি কৃষি ক্ষেত্রে সময়ের অপচয় রোধ করে। ব্যাখ্যা কর।
- গ. কাশিমপুর গ্রামের কৃষকদের বেশি ফলন লাভের কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. হরিপুর গ্রামের কৃষকদের জন্য রাসেল সাহেবের উদ্যোগটির মূল্যায়ন কর।

২. সচেতন কৃষক রাফিক সাহেব ফসল উৎপাদনের জন্য সবসময়ই ভালো গুণসম্পন্ন বাছাইকৃত বীজ ব্যবহার করেন। এ বছর গম চাষের জন্য তিনি কিছু বীজ ত্রয় করেন। বীজগুলো থেকে ১০০ গ্রাম বীজ নিয়ে বাছাই করে তিনি নিম্নের বস্তুগুলো পান :

- অন্য জাতের বীজ- ৫ গ্রাম ।
- ভাঙা ও পোকাখাওয়া বীজ- ৬ গ্রাম ।
- অপুষ্ট বীজ- ৩ গ্রাম ।
- আগাছার বীজ - ১ গ্রাম ।
- জড় পদার্থ- ১ গ্রাম ।

ক. ভালো বীজের রং কেমন হবে?

খ. বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণ উন্নত জাতের বীজকে নির্ণয় করে দেয়। ব্যাখ্যা কর।

গ. রাফিক সাহেব কর্তৃক বাছাইকৃত বীজের শতকরা হার বের কর।

ঘ. অধিক ফসল উৎপাদনে রাফিক সাহেবের কাজটি মূল্যায়ন কর।

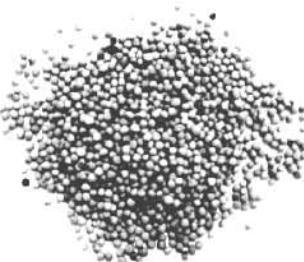
তৃতীয় অধ্যায়

কৃষি উপকরণ

ফসল উৎপাদনে কৃষি উপকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি উপকরণগুলোর মধ্যে মাটি, পানি, বীজ, সার উল্লেখযোগ্য। কোন মাটিতে কোন ফসল জন্মাবে, ভালো বীজের বৈশিষ্ট্যগুলো কেমন, ফসলে সেচের দরকার আছে কি না, অতিরিক্ত পানি ফসলের ক্ষতি করছে কি না, জমিতে কী কী সার প্রয়োগ করা দরকার, এসব সম্পর্কে আমরা এ অধ্যায়ে বিস্তারিত জানব।



চিত্র : দোআংশ মাটি



চিত্র : সরিষা বীজ



চিত্র : টিএসপি সার

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- ব্যবহার অনুযায়ী উপযুক্ত মাটি শনাক্ত করতে পারব।
- কৃষি ফলনে মাটির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষি ক্ষেত্রে পানির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বীজের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
- সারের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
- কৃষিকাজে সার ব্যবহারের উপযোগিতা মূল্যায়ন করতে পারব।
- কৃষিকাজে পানির পরিমিত ব্যবহারে সচেতন হব।
- রাসায়নিক সার অতিরিক্ত ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।

পাঠ-১ : মাটির গঠন

মাটি একটি প্রাকৃতিক বস্তু এবং মিশ্র পদার্থ। এ মাটিতে চাষাবাদ করে মানুষ শস্য ফলায়। আমরা কি জানি, এ মাটি কীভাবে তৈরি হয়েছে? বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবী প্রথমে একটি জলন্ত অগ্নিগোলকের পিণ্ড ছিল। দীর্ঘকাল তাপ বিকিরণ করতে করতে এ পিণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে শিলাময় শক্ত ভূ-ত্বক সৃষ্টি করেছে। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় শিলা কালক্রমে ক্ষয় হয়ে মাটির সৃষ্টি হয়েছে।

পরিশেষে বলতে পারি, মাটি হলো :



- (১) প্রাকৃতিক বস্তু, যা ধনিজ ও জৈব পদার্থের সমন্বয়ে ঘটিত;
- (২) ভূ-পৃষ্ঠের স্বচচেয়ে উপরের স্তর, যা উজ্জিদকে অবলম্বন দেয়;
- (৩) বিভিন্ন পুরুত্ববিশিষ্ট নানা স্তর দ্বারা গঠিত যার প্রতিটি স্তরের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক ধর্ম বিভিন্ন।

মাটির গঠন উপাদান : মাটি প্রধানত ৪টি উপাদান দ্বারা গঠিত। উপাদানগুলো হলো— (১) অজৈব পদার্থ বা ধনিজ পদার্থ (২) জৈব পদার্থ (৩) পানি ও (৪) বায়ু।

চিত্র : মাটির গঠন

১। **ধনিজ পদার্থ :** আমরা পূর্বেই জেনেছি, ভূ-পৃষ্ঠ প্রক্রতিপক্ষে শিলা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। প্রাকৃতিক শক্তি তথ্য তাপ, চাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, পানিপ্রবাহ ইত্যাদির প্রভাবে সময়ের ব্যবধানে আদি শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটির অজৈব বা ধনিজ পদার্থ সৃষ্টি করেছে। নৃড়িপাথর, বালিকগা, পলিকগা ও কর্দমকগা হচ্ছে মাটির ধনিজ পদার্থ। এসব ধনিজ পদার্থ নানাভাবে মিশে মাটির বুনট সৃষ্টি হয়েছে। মাটিতে ধনিজ পদার্থের পরিমাণ আয়তন ভিত্তিতে শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ অর্থাৎ মাটির সর্ববৃহৎ অংশ জুড়ে আছে।

২। **জৈব পদার্থ :** জৈব পদার্থ মাটির একটি শুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জীবজগতের মৃতদেহ, গাছপালা, লতাপাতা, খড়কুটা, প্রাণীর মলমূত্র, প্রভৃতি মাটিতে পচে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়। মাটিতে আয়তনের ভিত্তিতে শতকরা ৫ ভাগ জৈব পদার্থ থাকে। জৈব পদার্থকে মাটির প্রাণ বলা হয়। কেননা জৈব পদার্থের উপস্থিতিতে মাটির অণুজীবগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

এছাড়াও জৈব পদার্থ— (১) মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক ধর্মাবলি উন্নত করে; (২) ভূমিক্ষয় রোধ করে (৩) মাটিতে পানি ও বায়ু চলাচল সহজতর করে (৪) মাটিতে কেঁচোর সংখ্যা ও এর কার্যাবলি বাঢ়ায়; (৫) মাটির রস ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। **পানি :** মাটির একটি অতি শুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পানি। মাটির বিভিন্ন কণার মধ্যবর্তী ফাঁকা ছানে পানি অবস্থান করে। মাটির পানি উজ্জিদের পুষ্টি উপাদানগুলোকে স্তর রাখে এবং মাটিকে রসাল রাখে।
৪। **বৃষ্টিপাত, বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাস্প, ভূ-গর্ভস্থ পানি** ও সেচব্যবস্থা থেকে প্রাণ পানিই মাটির পানির প্রধান উৎস। আদর্শ মাটিতে পানির পরিমাণ হলো শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ।

৪। বায়ু : বায়ু মাটির একটি শুল্কত্বপূর্ণ উপাদান। মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে বায়ু থাকে। উদ্ভিদের শিকড় ব্যাকটেরিয়া, ছাঁচাক ও অন্যান্য অগুজীবের কর্মসূত্রগতার জন্য যে অঙ্গিজেনের প্রয়োজন, তা মাটিতে অবস্থানরত বায়ু সরবরাহ করে। আদর্শ মাটিতে বায়ুর পরিমাণ হলো শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ।

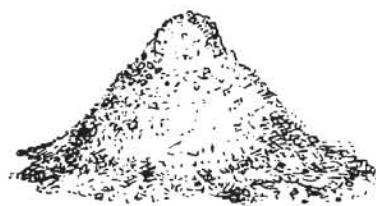
কাজ : মাটির গঠন উপাদানের শতকরা হারের পেপার মডেল তৈরি করে সে মডেলগুলো শ্রেণিকক্ষে টানিয়ে রাখ।

পাঠ-২ : মাটির প্রকারভেদ

যেসব খনিজ কণার ব্যাস দুই মিলিমিটার বা তার কম, তাকে মাটির কণা বলা হয়। আমরা জানি, এ কণার ধারাই মাটির বুনট সৃষ্টি হয়। মাটির বুনট হলো মাটির বালি, পলি, কর্দমকণার তুলনামূলক পরিমাণ বা শতকরা অনুপাত। মাটির এসব কণা বিভিন্ন অনুপাতে বিভিন্ন প্রকার মাটির সৃষ্টি করে। আর মনে রাখব, এসব কণার আকারও ডিম্ব ডিম্ব হয়।

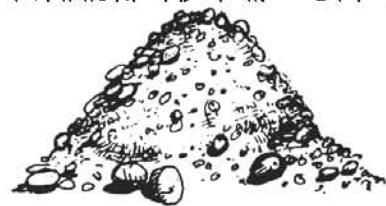
এবার আমরা মাটির শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জানব। কোন মাটিতে কোন ফসল জন্মায় তা জানার জন্যই মাটির শ্রেণিবিভাগ জানা খুবই দরকার। কৃষিকাজে ব্যবহারের সুবিধার জন্য বুনটের উপর ভিত্তি করে মাটিকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা— (১) বেলে মাটি (২) দোআঁশ মাটি ও (৩) এঁটেল মাটি।

(১) **বেলে মাটি** : যে মাটিতে শতকরা ৭০ ভাগ বা তারও বেশি বালিকণা থাকে, তাকে বেলে মাটি বলে। মোটা কণাযুক্ত বেলে মাটিতে ফসলের চাষ করা যায় না। তবে বেলে মাটিতে প্রচুর কম্পোস্ট, গোবর ও সবুজ সার প্রয়োগ করে চিনা, কাউন, ফুটি, আলু, তরমুজ ইত্যাদি চাষ করা সম্ভব।



চিত্র : বেলে মাটি

(২) **দোআঁশ মাটি** : যে মাটিতে বালিকণার পরিমাণ শতকরা ৭০ ভাগের কম কিন্তু ২০ ভাগের বেশি, তাকে দোআঁশ মাটি বলে। তবে আদর্শ দোআঁশ মাটিতে অর্ধেক বালিকণা এবং বাকি অর্ধেক পলি ও কর্দমকণা থাকা আবশ্যিক। চাষাবাদের জন্য এ মাটি উদ্দীপ্ত। এ মাটিতে সব ধরনের ফসল ভালো জন্মে। বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকার মাটি দোআঁশ প্রকৃতির। দোআঁশ মাটিকে আবার ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা— (১) বেলে-দোআঁশ মাটি (২) পলি-দোআঁশ মাটি (৩) এঁটেল-দোআঁশ মাটি।



চিত্র : দোআঁশ মাটি

(৩) এঁটেল মাটি : যে মাটিতে কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ কর্দমকণা থাকে, তাকে এঁটেল মাটি বলে। এ মাটিতে পলিকণা ও বেশি থাকে। ঢাকা জেলার উত্তরাংশ, টাঙ্গাইল জেলার পূর্বাংশ ও ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে এ মাটি দেখা যায়। এ মাটিতে চাষ করা খুব কষ্টকর। জৈব সার প্রয়োগে চাষের উপযোগী করা সম্ভব। ধান, পাট, আখ ও শাকসবজি এ মাটিতে ভালো জন্মে।



চিত্র : এঁটেল মাটি

কাজ ১ : নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ- (১) মাটির বুন্ট কী? (২) কীভাবে মাটির বুন্ট নির্ধারিত হয়? (৩) বুন্টের উপর ভিত্তি করে মাটি কত প্রকার ও কী কী? (৪) চাষাবাদের সবচেয়ে উপযোগী মাটি কোনটি?

কাজ ২ : বেলে, দোআশ ও এঁটেল মাটিতে জন্মায় এরূপ ফসলের একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ-৩ : মাটির গুণাগুণ

ফসল উৎপাদনে মাটির গুণাগুণ প্রভাব বিস্তার করে। কোন মাটিতে কোন ধরনের ফসল উৎপাদন করা যাবে তা মাটির গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। মাটির সকল গুণবলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) ভৌত গুণাগুণ (খ) রাসায়নিক গুণাগুণ (গ) জৈবিক গুণাগুণ।

(ক) মাটির ভৌত গুণাগুণ : মাটির ভৌত গুণাগুণ বলতে ১) মাটির বুন্ট ২) মাটির সংযুতি ৩) মাটির ঘনত্ব ৪) মাটির বর্ষ (৫) মাটির তাপমাত্রা ৬) মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ৭) মাটির বায়ু চলাচল ইত্যাদিকে বোঝায়।

(খ) মাটির রাসায়নিক গুণাগুণ : মাটির রাসায়নিক গুণাগুণ বলতে ১) মাটির অয়ত্ন ক্ষারত্ব ২) উত্তিদের জন্য সহজলভ্য পৃষ্ঠি উপাদানের পরিমাণ ৩) মাটির লবণাক্ততা ইত্যাদিকে বোঝায়।

(গ) মাটির জৈবিক গুণাগুণ : মাটির জৈবিক গুণাগুণ বলতে ১) অণুজীবের প্রকার ২) অণুজীবের সংখ্যা ৩) অণুজীবের কার্যাবলি ইত্যাদিকে বোঝায়।

কৃষি ফসলে মাটির গুণাগুণের গুরুত্ব : ফসল উৎপাদনে মাটির গুণাগুণের গুরুত্ব অপরিসীম। মাটির ভৌত গুণবলির মধ্যে মাটির বুন্ট, মাটির সংযুতি, মাটির ঘনত্ব ইত্যাদি ফসল উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে। মাটির বুন্টের পার্থক্যের কারণে মাটিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। দোআশ মাটিতে অধিকাংশ ফসল ভালো জন্মে। এঁটেল মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি বলে এ মাটিতে ধান ভালো জন্মে। বেলে মাটিতে বাদাম, আলু, কুটি, তরমুজ ইত্যাদি ফসল জন্মে। মাটির বালি, পলি ও কর্দমকণা যে দলাকৃতিতে সঞ্চিত থাকে তাকে মাটির সংযুতি বলে। দানাদার, চূর্ণকার সংযুতি ফসল চাষের জন্য বেশি উপযোগী। থালাকার সংযুতির মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি। মাটির রাসায়নিক গুণাগুণের মধ্যে মাটির অয়ত্ন, ক্ষারত্ব, লবণাক্ততা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ ফসল বেশি অঙ্গীয়, ক্ষারীয় বা লবণাক্ততা পছন্দ করে না অর্থাৎ নিরপেক্ষ মাটি ফসল চাষের জন্য বেশি উপযোগী। এ ধরনের মাটিতে উত্তিদের জন্য সহজলভ্য পৃষ্ঠি উপাদান বেশি থাকে ও অণুজীবিক কার্যাবলি সঞ্চয় থাকে।

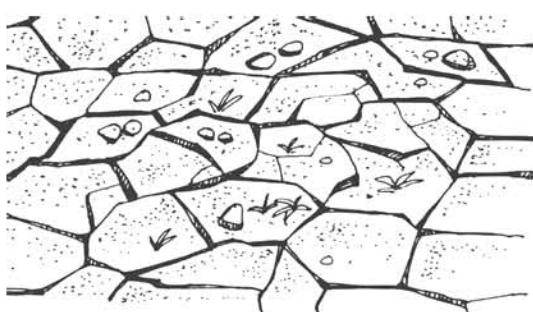
কেঁচো, ছাঁক, ব্যাটেরিয়া, শৈবাল ইত্যাদি জীব ও অণুজীবের সংখ্যা, প্রকার এবং ক্রিয়াকলাপই মাটির জৈবিক গুণাবলি। এসব জীব ও অণুজীব মাটিতে হিউমাস উৎপাদন ও ফসলের জন্য পৃষ্ঠি উপাদান সহজলভ্য করার মাধ্যমে প্রভৃতি উপকার করে।

কাজ : বেলে, দোআঁশ ও এঁটেল মাটির গুণগুণগুলো লিখে উপস্থাপন কর।

পাঠ-৪ : সেচ

আমরা কি জানি, জীবের দেহে কোন উপাদানটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে? কোন বস্তুটি ছাড়া পৃথিবীতে কোনো জীবের অঙ্গিত্ব সম্ভব নয়? কোন পদার্থটিকে জীবের জীবন বলা হয়? সবকটি প্রশ্নের উত্তরে বলব ‘পানি’। তাহলে জীব এ পানি কোথা থেকে পায়? গাছ একটি জীব, সে পানি পায় সেচ বা বৃষ্টি থেকে। যখন পানি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয়, তখন তা সরানোর প্রয়োজন পড়ে, যাকে নিষ্কাশন বলে। এখন আমরা পানি সেচ ও পানি নিষ্কাশন সম্পর্কে আলোচনা করব।

ফসলের গাছ বড় হওয়ার জন্য জমিতে কৃতিয় উপায়ে পানি সরবরাহ করাকেই সেচ বলা হয়। যেকোনো জীবের বাঁচার জন্য যেমন পানি অপরিহার্য, ফসলের জন্যও তেমনি। ফসল সুন্দরভাবে বাঁচার ও ফলন দেবার জন্য মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি ও পানিতে দ্রবীভূত পৃষ্ঠি উপাদান সংগ্রহ করে। ধৰা, অনাবৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে ফসলের জমিতে পানির আবশ্যকতা দেখা দেয়। আধুনিক কৃষিব্যবস্থায় সেচ অত্যাৰশ্যক।



চিত্র : খরা কৃষিত জমির ফসল



চিত্র : স্বাভাবিক জমির ফসল

সেচের পানির উৎস

সেচের পানি প্রধানত ২টি উৎস থেকে পাওয়া যায়, যথা— (ক) ভূ-পৃষ্ঠাত্ত্ব পানি; (খ) ভূ-গর্ভাত্ত্ব পানি। ভূ-পৃষ্ঠাত্ত্ব পানির উৎস হচ্ছে নদী, ধান, বিল, হাওর, বাঁওড়, পুকুর প্রভৃতির পানি। বৃষ্টিপাতের কারণে প্রধানত এসব পানি জমা হয়।



চিত্র : ধানক্ষেতে সেচের পানির বিভিন্ন উৎস

পক্ষান্তরে, কূপ খনন করে বা নলকূপ ঢারা ভূ-গর্ভের পানি উদ্বেলন করে সেচ দেওয়া হয়। এ পানিকেই ভূ-গর্ভস্থ পানি বলে। ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস হচ্ছে বৃষ্টির পানি।

পাঠ- ৫ : পানি সেচের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু এ বৃষ্টিপাত সবসময় কাজে লাগে না। তাই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে ফসল চাষাবাদ করলে সবসময় ভালো ফলন পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে বর্ষাকালে বেশি বৃষ্টি হলেও শীত মৌসুমে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। এ ছাড়া দেশের পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষাকালেও বৃষ্টিপাত কম হয়। ফলে পানির অভাবে ফসলের ফলন কম হয়। এ অবস্থায় ফসলের ফলন বাড়ানোর জন্য পানি সেচ দিতে হয়। প্রতিটি ফসলের বৃক্ষির বিভিন্ন পর্যায়ে পানির চাহিদায় ভিন্নতা রয়েছে। আর এই চাহিদা অনুযায়ী ফসলে পানি সেচ দিতে হয়।

সেচের পানির উপকারিতা : (১) উষ্ণিদ শিকড়ের সাহায্যে পানি পরিশোষণ করে। (২) উষ্ণিদ মাটি থেকে পানি পরিশোষণের সাথে পুষ্টি উপাদান আহরণ করে। (৩) সেচের মাধ্যমে মাটির তাপমাত্রা ঠিক রাখা যায়। (৪) অগুজীবের কার্যকারিতা ও পুষ্টি উপাদানের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পায়।

অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন : জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হয়। জমি থেকে এই অতিরিক্ত পানি সরিয়ে ফেলাকেই পানি নিষ্কাশন বলে। জমিতে অতিরিক্ত পানি জমলে গাছের শিকড় অঞ্চলে অক্রিয়েনের অভাব দেখা দেয়, ফলে অনেক গাছ মারা যায়।



চিত্র : শিকড়ের সাহায্যে পানি পরিশোষণ

পাঠ-৬ : মাছ চাষে পানি



চিত্র : পুরুষ



চিত্র : নদী



চিত্র : ধান

আমরা উপরের চিত্রগুলো দেখ করি। কী দেখতে পাইছ? পুরুষে পানি, নদীতে পানি ও ধানে পানি। আমরা কি জানি, এ পানিতে কোন জীব বাস করে? আর এ জীব আমরা খেতে আমিদের চাহিদা পূরণ করে থাকি। উভয়ে আমরা বজে যাই। তাহলে যাই পানিকে চাষ করলে তার এ আবাস সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা দরকার। আমরা জানি, আমাদের বসবাসের জন্য যেমন বাঢ়ি ও বাড়ির পরিবেশ থাকা দরকার, তেমনি মাছের জন্য তার বসবাসের জারগা পানির পরিবেশ সুস্থল থাকা দরকার। কাজেই এসো আমরা যাই চাষে পানির গুণাগুণ ও তার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করি।

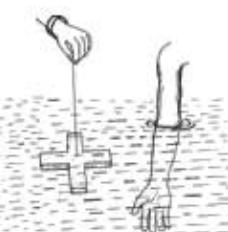
পানির ভৌত গুণাগুণ ও যাই চাষে তার প্রভাব : পানির ভৌত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পুরুষের উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। যাই চাষের পানির ভৌত গুণাগুণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. পানির বর্ণ

পানির বর্ণ হালকা সবুজ হলে তা পুরুষের অধিক উৎপাদনশীলতা নির্দেশ করে। বিভিন্ন ধরনের জৈব ও অজৈব প্রয়োগের উপরেও পানির বর্ণ বিভিন্ন রকম হবে থাকে। রং দেখে পানির উৎপাদন শক্তি আন্দাজ করা যায়। পানির রং সবুজ বা বাদামি হলে বোঝা যাবে পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য আছে। পুরুষে নিয়ন্ত্রিত সার প্রয়োগ করলে উক্ত রং বজায় থাকবে।

২. পানির ঘৱতা

পানির ঘৱতা ২৫ সেন্টিমিটার বা তার কম হলে পুরুষের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি হয়। পানিতে কমুই পর্যন্ত ঘৱত স্ফুরণের পর যদি ঘৱতের তালু সেখা যায়, তবে বুঝতে হবে যাছের জন্য যেশি খাদ্য নেই। তখন পুরুষে সার দিতে হয়।

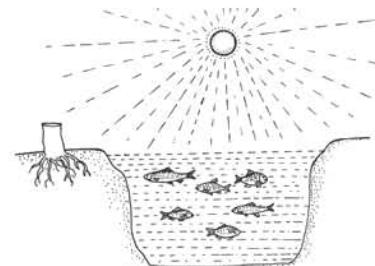


চিত্র : পুরুষ ও মহিলা পুরুষ

৩. পানির গভীরতা : পানির গভীরতা মাছ চাষের জন্য একটি শুল্কত্বপূর্ণ উপাদান। মাছ চাষের জন্য পুরুরের পানির গভীরতা কমপক্ষে ১.৫ মিটার থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। তবে ২ মিটার গভীরতা মাছ চাষের জন্য উচ্চ। পানির গভীরতা খুব বেশি হলে সূর্যের আলো পানির গভীরে পৌছতে পারে না। আবার পানির গভীরতা খুব কম হলে সূর্যের ভাগে পানি গরম হয়ে উঠে।
৪. পানির তাপমাত্রা : পানির তাপমাত্রার উপরও মাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে। শীতকালে মাছের বৃদ্ধি কম হয় এবং গরমকালে বেশি বাঢ়ে। যেমন : রাই জাতীয় মাছ চাষের জন্য 25° - 30° সেলসিয়াস তাপমাত্রা উচ্চ।

৫. সূর্যালোক

সূর্যালোকের উপর খাদ্য উৎপাদন নির্ভর করে। তাই পুরুর পাড়ের বড় গাছগালা কেটে পানিতে সূর্যালোক প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। পুরুরে ভাসমান কুচুরিপালা, শেওলা ও আগাছা ইত্যাদিও পানিতে সূর্যালোক প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে।



চিত্র: পুরুরে সূর্যালোক

পানির রাসায়নিক শুণ্ডণ ও মাছ চাষে তার অভাব

মাছ চাষের পানির রাসায়নিক শুণ্ডণের মধ্যে কয়েকটি আলোচনা করা হলো :

১. দ্রব্যীভূত অক্সিজেন : জলজ উদ্ধিদ থেকে অক্সিজেন ছাড়ে তা পানিতে দ্রব্যীভূত হয়। বাতাস থেকেও কিছু অক্সিজেন সরাসরি পানিতে যিশে। পুরুরে অবস্থিত মাছ, জলজ উদ্ধিদ ও প্রাণী এ অক্সিজেন দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। অক্সিজেনের অভাবে মাছ দলবদ্ধভাবে পানির উপর ভেসে বেড়ায়। একে মাছের খাবি খাওয়া বলে।

পানিতে অক্সিজেন দ্রাসের কারণ : (১) পানিতে গাছের পাতা ও ডালগালা পচা (২) কাঁচা গোবর বেশি পরিমাণে ব্যবহার (৩) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা (৪) পানি খুব ঘোলা হওয়া।

অক্সিজেনের ঘাটতি পুরুরের উপর : পানির উপরিভাগে চেউ সৃষ্টি করে তাঙ্কণিকভাবে পানিতে অক্সিজেনের অভাব পূরণ করা যায়। সাঁতার কেটে বা বাঁশ দিয়ে পানির উপর পিটিয়ে এ চেউ সৃষ্টি করা যায়।

২. দ্রব্যীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইড : কোনো কারণে পানিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পুরুরের তলায় অত্যধিক জৈব পদার্থ ও কাদা থাকলে অধিক তাপমাত্রায় পুরুরে এ গ্যাসের আধিক্য ঘটে।
৩. পানির পি-এইচ : পানি অমুখর্মী না ক্ষারধর্মী, তা পি-এইচ মিটার দ্বারা পরিমাপ করা যায়। পি-এইচ ৭-এর কম হলে পানি অল্লীয়, ৭-এর বেশি হলে পানি ক্ষারীয় এবং ৭ হলে পানি নিরপেক্ষ। সামান্য ক্ষারধর্মী পানি মাছ চাষের জন্য ভালো। তবে পানির পি-এইচ 6.5 - 8.5 হলে পানি প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক হয়।
৪. ফসফরাস : ফসফরাস পানিতে মাছের খাদ্যের পরিমাণ বাড়ায়।
৫. নাইট্রোজেন : নাইট্রোজেন জলজ অণুজীবের জন্য খুবই উপকারী। আর এ অণুজীবই মাছের প্রধান খাদ্য।

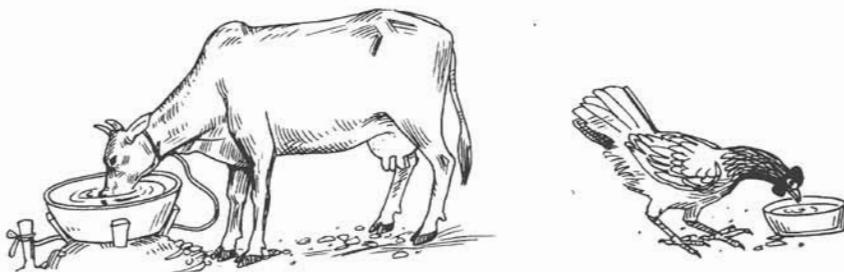
৬. পটানিয়াম : মাছের খাদ্যচাহিদা পূরণের জন্য পানিতে পটাশ দিতে হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, মাছ চাষে পানির অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পানির গুণাগুণ এর উপর জলাশয়ে মাছের উৎপাদন নির্ভর করছে।

কাজ : ‘মাছ চাষে পানি’ গুণাগুণের অভাব দলগতভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

পাঠ-৭ : গৃহপালিত পশু-পাখির খাবার পানি

পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া মানুষ, পশু-পাখি, গাছপালা কোনো জীবই বাঁচতে পারে না। পুষ্টি উপাদান দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরের জন্য পানি প্রয়োজন। এটি হজম, বিপাকপ্রক্রিয়া ও দূষিত পদার্থ দেহ থেকে নির্গত হতে সাহায্য করে। শরীরের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পানির ভূমিকা রয়েছে। পানি জীবদেহের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান। দেহের গঠনের উপাদানের মধ্যে পানির পরিমাণ সবচেয়ে অধিক। আণিদেহের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই পানি।



চিত্র : গৃহপালিত পশু-পাখি পানি পান করছে

গৃহপালিত পশু-পাখির খাবার পানির উৎস : নলকূপ, কুঁড়া, পুকুর ইত্যাদির পরিকার ও বিশুদ্ধ পানি।

পশু-পাখির দেহে পানির কার্বকারিতা : (১) পানি খাদ্যকে শোষণ করতে সাহায্য করে। (২) দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। (৩) পুষ্টি উপাদান কোষে পৌছাতে সাহায্য করে। (৪) দেহে তারল্য বজায় রাখে (৫) বিভিন্ন প্রকার পাচকরস পরিবহনে সাহায্য করে।

পশু-পাখির পানির ঘাটতিজ্জনিত সমস্যা : পরিমিত পরিমাণে পানি গ্রহণ না করলে তাদের অন্যান্য খাদ্য গ্রহণ ও ব্যবহারে বিষয় সৃষ্টি হবে। পশু-পাখির উৎপাদন ও প্রজন্ম কয়ে ঘাবে। পশু-পাখির গর্ভকালীন পানির অভাবে পেটের বাচ্চা ও ডিম উৎপাদন হ্রাসের সম্মুখীন হবে। এমনকি পানির অভাবে মারাও যেতে পারে।

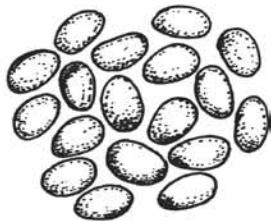
সমাধান : পশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিকার ও বিশুদ্ধ পানি খাওয়াতে হবে। পশু-পাখি ঘাবে কোনোভাবেই পঁচা বা দূষিত পানি না খেতে পারে, সেদিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। পানি জীবাণুমুক্ত হতে হবে। এছাড়া পানির প্রয়োজনীয়তা খাদ্য, আবহাওয়া ও বয়সের উপর নির্ভর করে। শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালে পানি বেশি প্রয়োজন। শুকনো ঘাস ও দানাদার খাদ্য বেশি খাওয়ালে পানি বেশি প্রয়োজন হবে।

পানির চাহিদা : দুধেল গাড়ির পানির বেশি প্রয়োজন। একটি দুধেল গাড়ি দৈনিক ৩০-৪০ লিটার পানি পান করে থাকে। একটি মূরগি তার খাদ্যের দ্বিতীয় পানি পান করে। হিসাব করে দেখা গেছে, একটি মূরগি দৈনিক ২০০-৩০০ মিলি পানি পান করে।

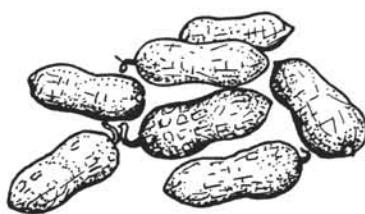
কাজ : 'দুধেল গাড়িকে অপর্যাপ্ত খাবার পানি খাওয়ালে কী হবে' সে সম্পর্কে খাতায় লিখ।

পাঠ-৮ : বীজের বৈশিষ্ট্য

উদ্ভিদের বংশবিভাবের মাধ্যম হলো বীজ। বীজ থেকেই নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়। সাধারণভাবে বীজ বলতে উদ্ভিদের নিষিক ও পরিপক্ষ ডিমককে বোঝায়। যেমন: ধান, গম, পাট ইত্যাদির বীজ। তবে ব্যাপকভাবে বীজ বলতে উদ্ভিদের যে কোনো জীবন্ত অংশ যা পরবর্তীতে বংশবিভাবের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন: ধান, মিষ্টি আলুর লতা, আখের কাণ, পাথর কুচির পাতা, পেঁয়াজ, গোলআলু ইত্যাদি।



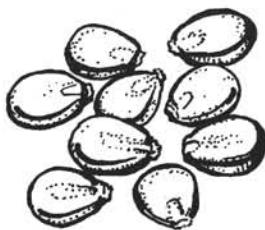
চিত্র : সয়াবিন (সোহাগ)



চিত্র : বাদাম



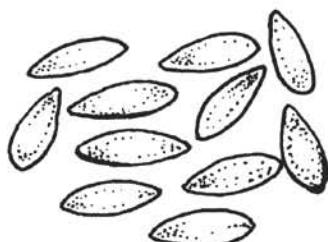
চিত্র : চেড়স



চিত্র : চুটা



চিত্র : মাষকলাই (বারি-৩)



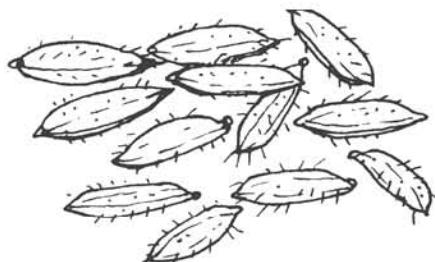
চিত্র : শসা

কাজ : শ্রেণিকক্ষে বাংলাদেশে জন্মে এমন কিছু উদ্ভিদের বীজ দেখে এগলো কোন কোন উদ্ভিদের বীজ তা শনাক্ত কর ।

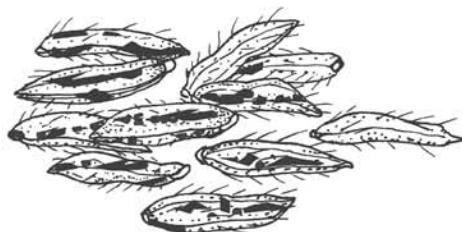
পাঠ- ৯ : ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য

আমরা এ পর্যন্ত অনেক বীজ দেখলাম এবং বীজের নাম শনাক্ত করতে পারলাম । এবার আমরা ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব ।

- বীজ বিশুদ্ধতা :** কাঞ্চিত ফসলের বীজের সাথে যেন অন্য ফসলের বীজ, আগাছার বীজ, কাঁকর জাতীয় পদার্থ প্রভৃতি মিশ্রিত না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে । এতে বীজের বিশুদ্ধতা বজায় থাকে না ।
- জাত বিশুদ্ধতা :** কোনো বীজের নমুনায় একই ফসলের অন্য জাতের বীজ থাকলে বীজের বিশুদ্ধতা নষ্ট নয় । যেমন : নাইজারশাইল ধানের বীজের সাথে বিনাশাইল ধানের মিশ্রণ থাকলে জাত বিশুদ্ধতা থাকে না । নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করলে জাত বিশুদ্ধতা বজায় থাকে ।
- গজানোর ক্ষমতা :** এ বিষয়টিকে বীজের অঙ্গুরোদগম ক্ষমতা বলে । কোনো বীজ নমুনায় কতোটি বীজ অঙ্গুরিত হবে সে হিসাব ধেকেই বীজের ভালোমন্দ শুণ বিচার করা হয় । উচ্চম বীজের অঙ্গুরোদগম ক্ষমতা ১০০% পর্যন্ত হতে পারে । কিন্তু সবসময় সব বীজ এ হারে গজায় না । কমপক্ষে ৮০% গজানোর হার সম্পর্ক বীজকে উচ্চম বীজ বলা যায় ।
- বীজের জীবনীশক্তি তেজ :** নমুনা বীজের চারা যদি সতেজ, সজীব ও স্বাস্থ্যবান হয় এবং প্রতিকূল অবস্থায় তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠতে পারে, তবে সে বীজকে তেজস্বী বীজ বলা হয় ।
- বীজের আর্দ্রতা :** নমুনা বীজের ঘধ্যে শতকরা কতো ভাগ পানি আছে, তাই বীজের আর্দ্রতা । বীজের আর্দ্রতা বীজকে বাঁচিয়ে রাখে । যেমন : দালা শস্যের বীজের আর্দ্রতা ৮-১০% রাখা উচ্চম ।



চিত্র : ধানের বীজ (স্বাভাবিক)



চিত্র : ধানের বীজ (অস্বাভাবিক)

- বীজের বর্ণ :** প্রত্যেক জাতের বীজের স্বতন্ত্র রং থাকে । আর তাই ভালো বীজের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক উজ্জ্বল রং থাকতে হবে । ভালো বীজ চেনার প্রথম লক্ষণই হচ্ছে বীজের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ।

পাঠ-১০ : বীজের শ্রেণিবিভাগ

বিভিন্নভাবে বীজের শ্রেণিবিভাগ করা যায় । যেমন :

১। ব্যবহারের ভিত্তিতে বীজকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় । যথা-

(ক) **উক্তিদত্তিক বীজ** : উক্তি বিজ্ঞানীদের মতে, নিষিক্ত ও পরিপক্ষ ডিম্বককে বীজ বলে ।
যেমন: ধান, পাট, গম ইত্যাদি বীজ ।

(খ) **কৃষিতাত্ত্বিক বীজ** : কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে, উক্তিদের যেকোনো অংশ যা উপযুক্ত পরিবেশে
আপন জাতের নতুন উক্তিদের জন্ম দিতে পারে, তাকে কৃষিতাত্ত্বিক বীজ বলে । যেমন:
আদা ও হলুদের কন্দ, মিষ্টি আলুর লতা, কাঁকড়োলের মূল, আখের কাণ্ড ইত্যাদি ।

২। বীজাবরণের উপস্থিতির ভিত্তিতে বীজকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় । যথা-

(ক) **অনাবৃত বীজ** : এসব বীজে কোনো আবরণ থাকে না । যেমন: পাইন, সাইকাস ইত্যাদি ।

(খ) **আবৃত বীজ** : এসব বীজের আবরণ থাকে । যেমন : ধান, সরিষা, ইত্যাদি ।

৩। বীজপত্রের সংখ্যার ভিত্তিতে বীজকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় । যথা-

(ক) **একবীজপত্রী বীজ** : এসব বীজে একটি মাত্র বীজপত্র থাকে । যেমন: ধান, গম, ভুট্টা
ইত্যাদি

(খ) **দ্বিবীজপত্রী বীজ** : এসব বীজে দুটি বীজপত্র থাকে । যেমন: ছোলা, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি ।

(গ) **বহুবীজপত্রী বীজ** : এসব বীজে দুইয়ের অধিক বীজপত্র থাকে । যেমন: পাইন ।

কাজ : বিভিন্ন বীজের কয়েকটি নমুনা মিশ্রণ থেকে নমুনা বীজগুলোর শ্রেণিবিন্যাস কর ।

পাঠ-১১ : সারের প্রকারভেদ

আমরা যেমন খাবার খাই, তেমনি উদ্ভিদও মাটি থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। উদ্ভিদের জীবনচক্র সম্পন্ন করার জন্য ১৭টি অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন হয়। তবে সবগুলো পুষ্টি উপাদানই উদ্ভিদের জন্য সমান পরিমাণে প্রয়োজন হয় না। এর মধ্যে কিছু পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদের জন্য বেশি পরিমাণে লাগে যেমন: নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ইত্যাদি। এই উপাদানগুলোকে আমরা জমিতে সার হিসেবে প্রয়োগ করি যেমন: ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি ইত্যাদি।

উৎস অনুবাদী সারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) জৈব সার।

খ) রাসায়নিক সার।



চিত্র : ইউরিয়া



চিত্র : টিএসপি



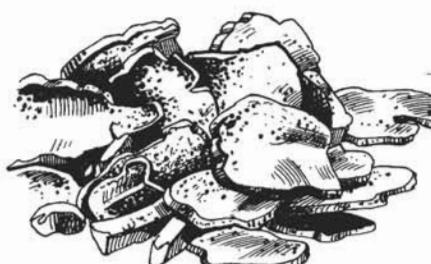
চিত্র : এমওপি

(ক) জৈব সার

যেসব সার জীবের দেহ থেকে প্রাণ অর্থাৎ উদ্ভিদ বা প্রাণীর ধ্বন্দ্বাবশেষ থেকে প্রস্তুত করা যায়, তাদেরকে জৈব সার বলে। যেমন : গোবর সার, কম্পোস্ট সার, সবুজ সার, খৈল ইত্যাদি। গাছের প্রয়োজনীয় প্রায় সব খাদ্য উপাদানই জৈব সারে থাকে।

জমিতে জৈব সার প্রয়োগের সুবিধা

- জৈব সারে ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদানই থাকে।
- মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।
- মাটির অগুজীবের কার্যাবলি বাড়ায়।
- মাটির সংস্থুতির উন্নতি ঘটায়।
- মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- মাটিতে বায়ু চলাচল বৃদ্ধি করে।



চিত্র : জৈব সার

(খ) রাসায়নিক সার

কলকারখানায় যে সকল সার তৈরি করা হয় তাদেরকে রাসায়নিক সার বলে। যেমন: ইউরিয়া, ডিএপি, জিপসাম, দস্তাসার।

কয়েকটি সারের নাম ও এদের সরবরাহকৃত পুষ্টি উপাদানের নাম নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলো:

সার	পুষ্টি উপাদান
ইউরিয়া	নাইট্রোজেন
ডিএসপি	ফসফরাস, ক্যালসিয়াম
এমওপি	পটাশিয়াম
ডিএপি	নাইট্রোজেন, ফসফরাস
জিপসাম	সালফার, ক্যালসিয়াম
দস্তাসার	জিংক, সালফার

রাসায়নিক সার প্রয়োগের সুবিধা

- ১। উদ্ভিদের প্রয়োজন অনুযায়ী মাটিতে সঠিক পরিমাণে পুষ্টি উপাদান যোগ করা হয়।
- ২। উদ্ভিদের পুষ্টি ঘাটতি দ্রুত মিটানোর জন্য রাসায়নিক সার খুবই কার্যকরী।
- ৩। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রাসায়নিক সার প্রয়োগের অসুবিধা

- ১। সুষম পরিমাণে ব্যবহার না করলে মাটি ও ফসলের ক্ষতি হয়।
- ২। রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়।
- ৩। অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে পরিবেশদূষণ ঘটে।

কাজ : জৈব সার ও রাসায়নিক সারের নামের তালিকা তৈরি কর।

পাঠ-১২ : কৃষিকাজে সারের ব্যবহার

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। প্রতিবছর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তাই অল্প জমি থেকে বেশি পরিমাণে ফসল উৎপাদনের জন্য সার ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য। তাই বাংলাদেশে সারের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশে প্রধানত জৈব ও অজৈব এই দুই ধরনের সার ব্যবহার হচ্ছে। তবে কোন সার কী পরিমাণে প্রয়োগ করতে হবে সে ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেমন :

- ১। মাটির উর্বরতার অবস্থা।
- ২। উৎপাদিত ফসলের ধরন ও জাত।
- ৩। সার প্রয়োগের সময় ও পদ্ধতি।
- ৪। সার অপচয়ের মাত্রা।
- ৫। মাটির আর্দ্রতার অবস্থা।

কাজ : ‘কৃষি ফলনে সারের ভূমিকা’ বিষয়ে দলগতভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. উড়িদের মাধ্যম হলো বীজ।
২. আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় অত্যাবশ্যক।
৩. ইউরিয়া সার।
৪. জৈব সার উর্বরতা বাড়ায়।

বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. টিএসপি সার	বংশবিস্তার।
২. ভূ-গর্ভস্থ সেচ	খনিজ পদার্থ।
৩. বীজ উদ্ভিদের প্রধান মাধ্যম	মিষ্টি আলুর লতা।
৪. মাটি গঠনে বেশি থাকে	নলকূপ।
৫. কৃষিতাত্ত্বিক বীজ	ফসফরাস।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বেলে মাটিতে কী কী ফসল চাষ করা যায়?
২. বীজের শুণাবলি কী কী?
৩. কীভাবে বীজের জাত বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. মাটির গঠন উপাদানগুলো বর্ণনা কর।
২. বীজের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ বর্ণনা কর।
৩. উদাহরণসহ সারের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ?

ক. আদা	খ. ভূটা
গ. পাট	ঘ. সরিষা
২. ইউরিয়া সার থেকে উদ্ভিদ কোন খাদ্য উপাদান পায়?

ক. নাইট্রোজেন	খ. ফসফরাস
গ. সালফার	ঘ. পটাশিয়াম
৩. জীবদেহে পানির কাজ হচ্ছে-
 - i. পুষ্টি উপাদান কোষে পৌছানো
 - ii. দেহে তারল্য বজায় রাখা
 - iii. পাচকরস পরিবহনে সাহায্য করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. অঙ্গ ব্যবহার করে বংশবিস্তার করা যায় কোন ফসলের?

- | | | | |
|----|------------------------|----|---------------------|
| ক. | ধান, শসা, গম | খ. | পাট, সরিষা, সয়াবিন |
| গ. | ভুট্টা, মাষকলাই, বাদাম | ঘ. | আখ, পটল, মিষ্টি আলু |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

‘ধলেশ্বরী’ নদী তীরের বাসিন্দা মর্জিয়া বেগম দুঁফু খামার করে কাঞ্চিত পরিমাণে দুধের উৎপাদন পেলেন। তার গাভি দুটি সুস্থ ও সুন্দর মসৃণ চামড়ার অধিকারী। খামার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ঘটের মধ্যে তিনি প্রতিদিন গাভি দুটিকে প্রয়োজনীয় পানি পান করাতেন।

৫. মর্জিয়া বেগম দুটি গাভিকে কত লিটার পানি দিতেন?

- | | | | |
|----|-------------|----|--------------|
| ক. | ২০-৪০ লিটার | খ. | ৬০-৮০ লিটার |
| গ. | ৪০-৬০ লিটার | ঘ. | ৮০-১০০ লিটার |

৬. মর্জিয়া বেগমের গাভি দুটির মসৃণ চামড়া থাকার কারণ কোনটি?

- ক. পরিমাণমত পানি পান করানো
- খ. প্রয়োজনীয় দানাদার খাদ্য খাওয়ানো
- গ. নির্দিষ্ট পরিমাণ কাঁচা ঘাস খাওয়ানো
- ঘ. নিয়মিত গাভিগুলোকে গোসল করানো

সূজনশীল প্রশ্ন

১. প্রত্যেক ফসল মাড়াই মৌসুমেই কৃষক মজিদের বাড়ির আঙিনায় খড়কুটা, চিটা ও লতাপাতা ইত্যাদি আবর্জনা ভরে যায়। এতে বাড়ির চারপাশের পরিবেশ নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে। উপসরকারী কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে মজিদ উক্ত আবর্জনা সম্বৰহারের পদ্ধতি গ্রহণ করলেন এবং তার কৃষিজগতে এগুলো প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন।

- ক. জৈব পদার্থ কাকে বলে?
- খ. জমিতে ফসল উৎপাদন বুনটের উপর নির্ভরশীল। ব্যাখ্যা কর।
- গ. মজিদ কীভাবে তার বাড়ির আবর্জনা সম্বৰহার করবে? পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মজিদের সিদ্ধান্তটি তার কৃষি কর্মকাণ্ডকে কীভাবে প্রভাবিত করবে তা বিশ্লেষণ কর।

২.

গ্রহণ	মাটির কণার প্রকৃতি	মাটির প্রকার	ফসল/বৈশিষ্ট্য
ক	৭০ ভাগ বালি	?	ফুটি, বাঞ্চি, তরমুজ
খ	৪০ ভাগ বালি	দেঁআশ	?
গ	৬০ ভাগ বালি	?	ধান চাষের উপযোগী কর

ক. মাটি কাকে বলে?

খ. জৈব পদার্থকে মাটির প্রাণ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

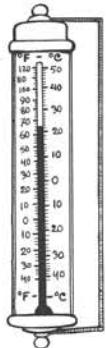
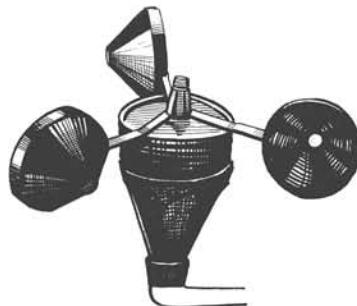
গ. ছকের গ্রহণ গ-এর মাটিকে কীভাবে ধান চাষের উপযোগী করা যায়, তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ছকের কোন গ্রহণের মাটি ফসল চাষের জন্য উত্তম কারণ বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষি ও জলবায়ু

কৃষিকাজ আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানের পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে ফসল চাষ, মাছ চাষ ও গৃহপালিত পশু-পাখি পালনের উপর। আবার জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বৈশিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, শুর্ণিবাড় ইত্যাদি দুর্ব্যোগ দেখা দিচ্ছে। আমরা এ অধ্যায়ে আবহাওয়া ও জলবায়ুর ধারণা, উপাদানসমূহ এবং কৃষিকাজে এর প্রভাব ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানব। পাশাপাশি বাংলাদেশের কৃষি পরিবেশ অঞ্চলগুলো কী, কী? বাংলাদেশের বৃষ্টিপাত, বন্যা ও জলোচ্ছাস প্রবণ অঞ্চলগুলো সম্পর্কেও জানব।



চিত্র: বায়ুর গতিমাপক যন্ত্র

চিত্র: তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র

চিত্র: বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- কৃষি কার্যক্রমে আবহাওয়া ও জলবায়ুর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভিত্তিতে কৃষি পরিবেশ অঞ্চল চিহ্নিত করতে পারব।
- বাংলাদেশের মানচিত্রে কম বৃষ্টি, বেশি বৃষ্টি, বন্যাপ্রবণ, জলোচ্ছাসপ্রবণ অঞ্চল চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ- ১ : আবহাওয়া ও জলবায়ু

আবহাওয়া : আমরা রেডিও ও টেলিভিশনে আবহাওয়ার খবর শুনি। এ খবর থেকে দিনের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি তথ্য জানতে পাই। আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আকাশ কেমন থাকবে সে তথ্যও জানতে পারি। আগাম এসব তথ্যকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলে। সুতরাং কোনো স্থানের দৈনন্দিন বায়ুমণ্ডলের অবস্থাকে আবহাওয়া বলে। আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

- ১) স্থানীয় মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
- ২) আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তনশীল।
- ৩) মাটির গুণাবলিতে তেমন প্রভাব ফেলে না।
- ৪) কোনো কোনো অঞ্চলে ফসলের পরিচর্যায় আবহাওয়া প্রভাব বিস্তার করে।

জলবায়ু : জলবায়ু পরিবর্তনের কথাটি আমরা প্রায়ই শুনতে পাই। জলবায়ু সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে আবহাওয়া সম্পর্কে জানতে হয়। কোনো স্থানের ২৫-৩০ বছরের আবহাওয়ার গড়কে সেই স্থানের জলবায়ু বলে। জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

- ১) জলবায়ু কোনো স্থানের দীর্ঘ সময়ের বায়ুমণ্ডলের গড় অবস্থা।
- ২) জলবায়ু ধীরে পরিবর্তনশীল।
- ৩) মাটির গুণাবলিতে প্রভাব ফেলে।
- ৪) কোনো কোনো অঞ্চলে ফসলের প্রকার ও জাত নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করে।

কাজ : আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য পয়েন্ট আকারে খাতায় লেখ এবং উপস্থাপন কর।

এখন আমরা আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

আবহাওয়ার উপাদান :

- ১) বারিপাত : বায়ুমণ্ডল থেকে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত পানিকে বারিপাত বলে। বৃষ্টি, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি, কুয়াশা, শিশির ইত্যাদি বারিপাতের অন্তর্ভুক্ত।
- ২) তাপমাত্রা : কোনো স্থানে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কত গরম বা ঠাণ্ডা, তাই তাপমাত্রা।
- ৩) বায়ুর গতি : কোনো স্থানে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বাতাস কত বেগে প্রবাহিত হচ্ছে, তাই বায়ুর গতি।
- ৪) বায়ুর দিক : বাতাস কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, সেটাই বায়ুর দিক।
- ৫) বায়ুর আর্দ্রতা : বাতাসে জলীয়বাস্পের পরিমাণকে বায়ুর আর্দ্রতা বলে।
- ৬) বায়ুর চাপ : ভূ-পৃষ্ঠের উপর বায়ু যে বল প্রয়োগ করে, তাকে বায়ুর চাপ বলে।
- ৭) মেঘমালা : আকাশে মেঘের পরিমাণ।
- ৮) দৃষ্টিগ্রাহ্যতা : খালি চোখে যত দূর পর্যন্ত দেখা যায়, তাকে দৃষ্টিগ্রাহ্যতা বলে।
- ৯) সূর্যালোক : দিনে কত ঘন্টা সূর্যের আলো পাওয়া যায় তার পরিমাণকে সূর্যালোক বলে।

জলবায়ুর উপাদান

- ১) সৌরবিকিরণ : পৃথিবীতে সব শক্তির উৎস হলো সৌরশক্তি। স্থান ও ঝুর্ত ভেদে সৌরবিকিরণ প্রাণ্তির পার্থক্যের কারণে আবহাওয়া ও জলবায়ুর তারতম্য হয়ে থাকে। সৌরবিকিরণ পৃথিবী পৃষ্ঠকে উৎক করে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া পানির বাঞ্চীভবন, বায়ুর গতিশীলতা, মেঘমালা সৃষ্টি ইত্যাদি সৌরবিকিরণের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয়।
- ২) বায়ুপুঞ্জ : বায়ু পুঁজীভূত আকারে নির্দিষ্ট পথে চলাচল করে। বায়ুপুঞ্জের উৎস স্থানের উপরও কোনো স্থানের আবহাওয়া ও জলবায়ু নির্ভর করে।
- ৩) বায়ুচাপ প্রক্রিয়া : বায়ুচাপের হ্রাস-বৃদ্ধি বৃষ্টিপাতের মৌসুমকে প্রভাবিত করে। বায়ুচাপ হ্রাস পেলে সাইক্লোন, মেঘ-বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ে। বায়ুচাপ বাড়লে শুক্র আবহাওয়া বিরাজ করে।
- ৪) সমুদ্রস্তোত : সমুদ্রস্তোত উপকূলবর্তী অঞ্চলের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতকে নিয়ন্ত্রণ করে। শীতল স্তোতের উপর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়ে এলে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত কমে। স্তোত উৎক হলে দুটোই বাড়ে।
- ৫) ভূমিবদ্ধুরতা : সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কোনো স্থানের উচ্চতা ঐ স্থানের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে। উচ্চতা বাড়লে তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ কমে।

নতুন শব্দ : আবহাওয়া, জলবায়ু, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান।

পাঠ- ২ : কৃষিকাজে আবহাওয়া ও জলবায়ুর গুরুত্ব

কৃষিকাজ আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদন আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ পাঠে আমরা ফসল চাষ, মাছ চাষ ও গৃহপালিত পশু-পাখি পালনে আবহাওয়া ও জলবায়ুর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

১। ফসল চাষ : বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশে সারা বছর নানা ধরনের ফসল জন্মে। বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন ধরনের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা বিদ্যমান থাকায় এ দেশ শস্য-শ্যামলা দেশে পরিণত হয়েছে। মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে এ দেশে প্রচুর ধান, পাট, শাকসবজি, ফলমূল জন্মে। অন্যদিকে শীতকালীন জলবায়ুর প্রভাবে নানা প্রকার ডাল, তৈলবীজ, শাকসবজি, মসলা ইত্যাদি রবি শস্য জন্মে। সুতরাং কৃষি উৎপাদনে জলবায়ুর প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে দৈনন্দিন কৃষিকাজ আবহাওয়ার উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। জমি তৈরি, বীজ বপন, সার প্রয়োগ, পানিসেচ, ফসল কর্তন, রোগ ও পোকামাকড়ের বিস্তার ইত্যাদি আবহাওয়ার উপাদান দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। যেমন: বৃষ্টি হলে জমি চাষ করা যায় না, আবার রোগ আমন রোপণের জমি তৈরির জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন।

২। মাছ চাষ : বাংলাদেশে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ফলে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা ইত্যাদি পানিতে ভরে যায়। এসব জলাশয়ে প্রচুর মাছ উৎপাদিত হয়। মাছের উৎপাদন ও বৎসরিতারে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব খুবই বেশি।

৩। গৃহপালিত পশু-পাখি : বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু গরু, ছাগল, মহিষ, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি গৃহপালিত পশু-পাখি পালনের উপযোগী। পশু-পাখির খাদ্যের জন্য এদেশে বিভিন্ন ধরনের ঘাস, লতা, গুল্ম প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানগুলো অস্বাভাবিক আচরণ করছে। ফলে কৃষি উৎপাদন হ্রাসের মুখে পড়ছে। এখন আমরা জলবায়ু পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে জানব।

জলবায়ু পরিবর্তন : জলবায়ু পরিবর্তন বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের গ্রিনহাউস প্রভাব বুঝতে হবে। শীতপ্রধান দেশে দামি সবজি, ফল গ্রিনহাউস বা কাচঘরে জন্মায়। কাচঘরের তাপমাত্রা বাইরের থেকে গরম থাকে, যা এই সব ফসলের জন্য অনুকূল। কাচঘরে যে আলো প্রবেশ করে তা বাইরে বের হতে পারে না বরং দুর্বল হয়ে তাপ উৎপাদন করে। ফলে কাচঘর গরম থাকে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলও গ্রিনহাউসের মতো অতিরিক্ত গরম হয়ে উঠছে। মানুষের নানাবিধি কর্মকাণ্ডের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন গ্যাসের পরিমাণ বাঢ়ছে। এ গ্যাসগুলো তাপ শোষণ করে বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণ করে তুলছে। একে গ্রিনহাউস প্রভাব বলে এবং এর জন্য দায়ী গ্যাসগুলোকে গ্রিন হাউস গ্যাস বলে। উনিশ শতকের শেষভাগ হতে গ্রিনহাউস প্রভাবের কারণে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্রের পানির উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে আবহাওয়া ও জলবায়ুর অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করা যাচ্ছে। এটাই জলবায়ু পরিবর্তন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ : শিল্পবিপ্লবের ফলে মানুষের ভোগ-বিলাসী জীবনযাপনের কারণে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন শিল্প-কারখানা, ধানবাহন, গৃহকার্য জৈব জ্বালানি পোড়াতে হয়। ফলে বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বাঢ়ছে। অন্যদিকে বিশ্বে প্রতিবছর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের খাদ্য, আবাসন ইত্যাদির জন্য বিপুল পরিমাণ বনভূমি উজাড় হচ্ছে। ফলে গাছ কর্তৃক কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণের ভারসাম্য বজায় থাকছে না।

জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল : জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, মেরু অঞ্চল ও পর্বতের হিমবাহের বরফ গলা, মরুকরণপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে। ফলে অতিবৃষ্টি, খরা, লবণাক্ততা, বন্যা, বন্যার তীব্রতা ও দীর্ঘস্থায়িত্ব বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধি, অতি গরম, অতি ঠাণ্ডা ইত্যাদি দুর্ঘোগ দেখা দিচ্ছে। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যবস্থাগুলোর পরিবর্তন আনার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে।

কাজ : কৃষিকাজে জলবায়ুর গুরুত্ব আলোচনা করে খাতায় লেখ।

নতুন শব্দ : জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রিনহাউস প্রভাব, গ্রিনহাউস গ্যাস।

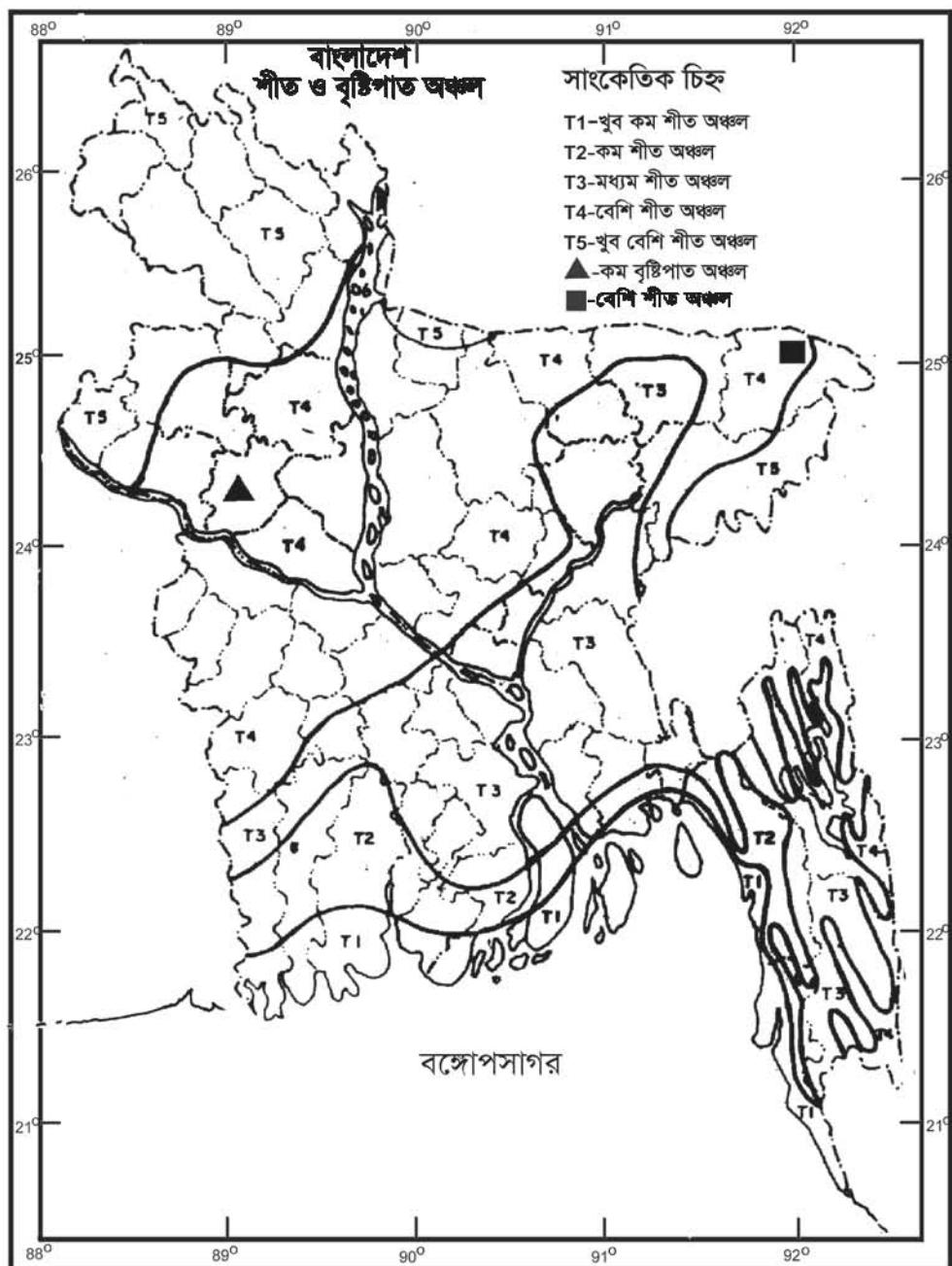
পাঠ- ৩ : বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে উচ্চতা ও দূরত্ব, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ দেশের জলবায়ু নাতীশীতোষ্ণ বা সমভাবাপন্ন। পরিমিত বৃষ্টিপাত, মধ্যম শীতকাল ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। শীতকালে (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি) উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত বায়ুতে তেমন জলীয়বাস্প থাকে না। ফলে তেমন বৃষ্টিপাত হয় না। অন্য দিকে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত মৌসুমি বায়ুতে যথেষ্ট জলীয়বাস্প থাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তাছাড়া মার্চ-এপ্রিল মাসে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে হঠাৎ ঝড় ও ঘূর্ণিঝড় হতে দেখা যায়। এটি কালবৈশাখী ঝড় নামে পরিচিত। এ ঝড়ের সাথে প্রায়ই শিলাবৃষ্টি হয়ে থাকে। এ ছাড়া গ্রীষ্মকালে সমুদ্রে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। যার ফলে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড় উপকূল এলাকায় আঘাত হানে। বাংলাদেশের জলবায়ুর কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হলো :

তাপমাত্রা: বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 34° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 21° সেলসিয়াস। এ দেশে শীতকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 29° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন 11° সেলসিয়াস হয়ে থাকে। জানুয়ারি শীতলতম মাস এবং গড় তাপমাত্রা 17.4° সেলসিয়াস হয়ে থাকে। শীতকালে দেশের দক্ষিণভাগে উপকূলের কাছাকাছি তাপমাত্রা বেশি থাকে এবং উত্তর দিকে তাপমাত্রা কম থাকে। শীতের স্থায়িত্ব ও তীব্রতার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে ৫টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে, যথা- T_1 , T_2 , T_3 , T_4 ও T_5 । তবে T_1 অঞ্চলে শীতের স্থায়িত্ব ও তীব্রতা সবচেয়ে কম, পর্যায়ক্রমে তা বেড়ে T_5 অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি হয়।

বৃষ্টিপাত : বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে বৃষ্টিপাতের যথেষ্ট তারতম্য হয়ে থাকে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১১০০ মিলিমিটার থেকে ৪৫০০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ বৃষ্টিপাতের প্রায় ৯০ শতাংশ এপ্রিল থেকে আগস্টের মধ্যে হয়ে থাকে। শীতকালে অতি সামান্য বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেশের পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশের সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত হয় নাটোরের লালগুরে এবং সর্বোচ্চ সিলেটের লালাখালে।

আর্দ্রতা : খাতুভেদে এদেশে আর্দ্রতার বেশ পার্থক্য দেখা যায়। শীতকালে বায়ুতে জলীয়বাস্প কম থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বায়ু বেশ আর্দ্র থাকে। বায়ুতে এ আর্দ্রতা বৃষ্টিপাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। শীতকালে বাতাসের গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৩% থেকে ৮৪% হয়ে থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে যা ৮৩% থেকে ৮৯% পর্যন্ত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ প্রায়ই অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্ঘাগের মুখোমুখি হয়।



চিত্র: মানচিত্রে বাংলাদেশের শীতের তীব্রতা ও স্থায়িভু অনুযায়ী
বিভিন্ন অঞ্চল এবং বৃষ্টিপাত অঞ্চল

পাঠ- ৪ : মাটি, পানি ও জলবায়ুর ভিত্তিতে কৃষি পরিবেশ অঞ্চল

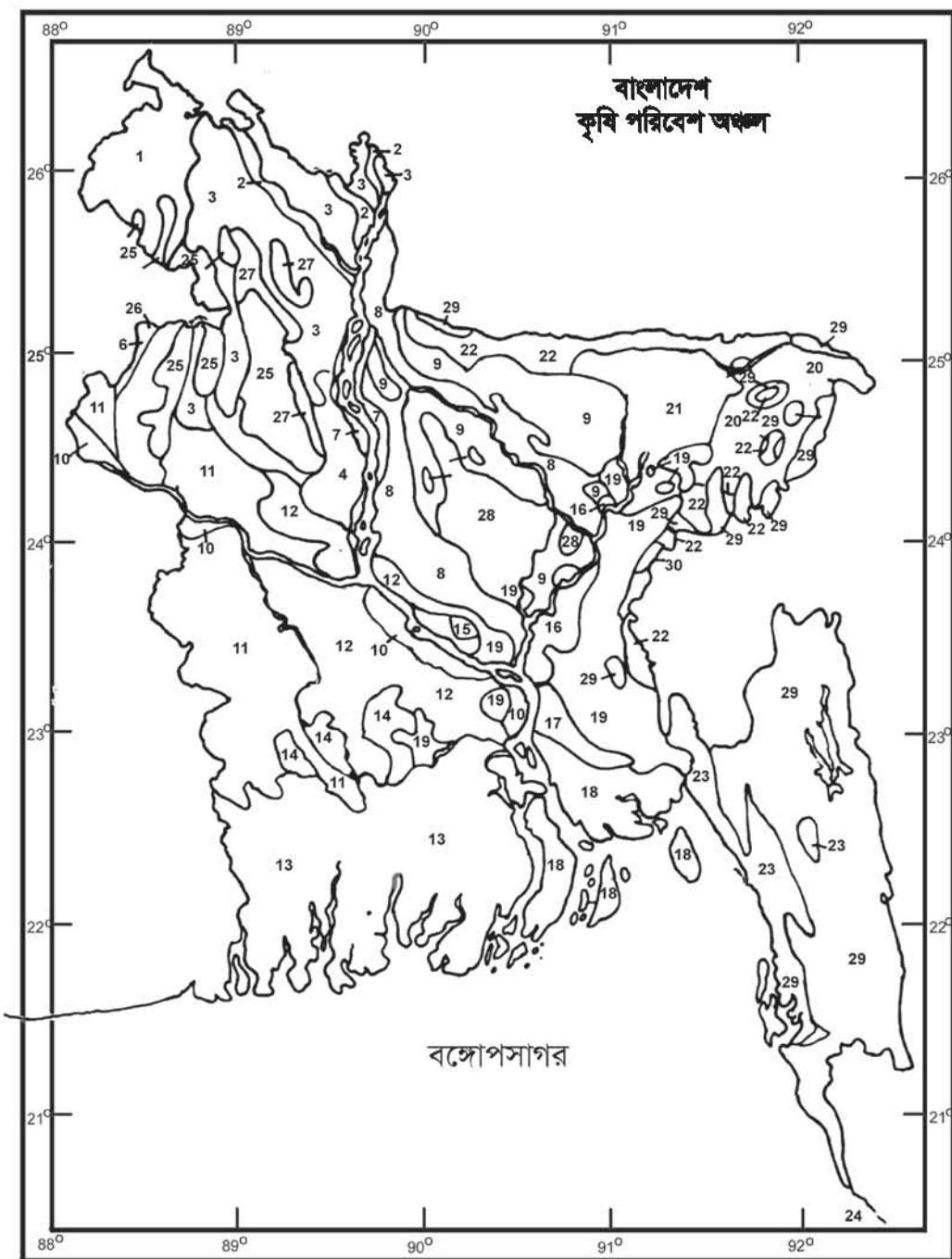
বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাটি, পানি ও জলবায়ুর ভিন্নতা রয়েছে। এ ভিন্নতার কারণেই এক এক অঞ্চলে এক এক রকম ফসল ভালো জন্মে। মাটি, পানি ও জলবায়ুর ভিত্তিতে সমগ্র বাংলাদেশকে ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এ শ্রেণিভাগ মাটির ধরন, উর্বরতা, ফসল জন্মানোর প্রকৃতি, জমিতে বন্যার সময় পানির উচ্চতা, এলাকাভেদে ফসল জন্মানোর সময়সীমা, বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রাকে বিবেচনা করে করা হয়েছে।

৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো

১. পুরাতন হিমালয় পাদদেশীয় সমভূমি অঞ্চল,
২. সক্রিয় তিস্তা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল,
৩. তিস্তা বাঁক প্লাবিত ভূমি অঞ্চল,
৪. করতোয়া-বাঙালি প্লাবিত ভূমি অঞ্চল,
৫. নিম্নতর আত্রাই অববাহিকা অঞ্চল
৬. নিম্নতর পুনর্ভৰ্বা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল,
৭. সক্রিয় ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল,
৮. নতুন ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল,
৯. পুরাতন ব্রহ্মপুত্র প্লাবিত ভূমি অঞ্চল,
১০. সক্রিয় গঙ্গা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল,
১১. উচু গঙ্গা নদী প্লাবিত ভূমি অঞ্চল,
১২. নিচু গঙ্গা নদী প্লাবিত ভূমি অঞ্চল,
১৩. গঙ্গার জোয়ার-ভাটা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল,
১৪. গোপালগঞ্জ খুলনা বিল অঞ্চল,
১৫. আড়িয়াল বিল অঞ্চল,
১৬. মধ্য মেঘনা নদী প্লাবিত ভূমি অঞ্চল,
১৭. নিম্নতর মেঘনা নদী প্লাবিত ভূমি অঞ্চল,
১৮. নতুন মেঘনা নদী প্লাবিত ভূমি অঞ্চল,
১৯. পুরানো মেঘনা মোহনা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল,
২০. সুরমা-কুশিয়ারা পূর্বদিকস্থ প্লাবিত ভূমি অঞ্চল,
২১. সিলেট অববাহিকা অঞ্চল,
২২. উত্তর ও পূর্বাঞ্চল পাদদেশীয় সমভূমি অঞ্চল,
২৩. চট্টগ্রাম উপকূল সমভূমি অঞ্চল,
২৪. সেন্টমার্টিন্স প্রবাল দ্বীপ অঞ্চল,
২৫. সমতল বরেন্দ্র অঞ্চল,
২৬. উচু বরেন্দ্র অঞ্চল,
২৭. উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বরেন্দ্রভূমি অঞ্চল,
২৮. মধুপুর অঞ্চল,
২৯. উত্তরাঞ্চলীয় ও পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য অঞ্চল,
৩০. আখাউড়া সোপান অঞ্চল।

কাজ : বাংলাদেশের মানচিত্রে কৃষি পরিবেশ অঞ্চলগুলোকে ৫টি বৃহত্তর অঞ্চলে ভাগ কর এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : কৃষি পরিবেশ অঞ্চল।



চিত্র : মানচিত্রে বাংলাদেশের কৃষি পরিবেশ অঞ্চল

পাঠ-৫ : বাংলাদেশের বন্যা, খরা ও জলোচ্ছাসপ্রবণ অঞ্চল

বন্যা : বন্যা পানিজনিত সৃষ্টি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশে চার ধরনের বন্যা দেখা যায়, যথা-

১) ঢল বন্যা : বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ের পাদদেশ অঞ্চলে এ ধরনের বন্যা দেখা দেয়। হঠাতে করে এপ্রিল ও মে মাসে সীমান্তে পাহাড়ি ঢলের কারণে এ বন্যা সৃষ্টি হয়। এ বন্যার পানি কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। হাওর এলাকার বোরো ধান পাকার সময় প্রায়ই ঢল বন্যায় ফসলহানি হয়ে থাকে।

২) বৃষ্টিজনিত বন্যা : অতিবৃষ্টির কারণে দেশের নিম্নাঞ্চল প্রাবিত হয়ে এ বন্যা দেখা দেয়। দেশের উত্তর, পশ্চিম এবং মধ্যাঞ্চলে এ ধরনের বন্যা দেখা দেয়।

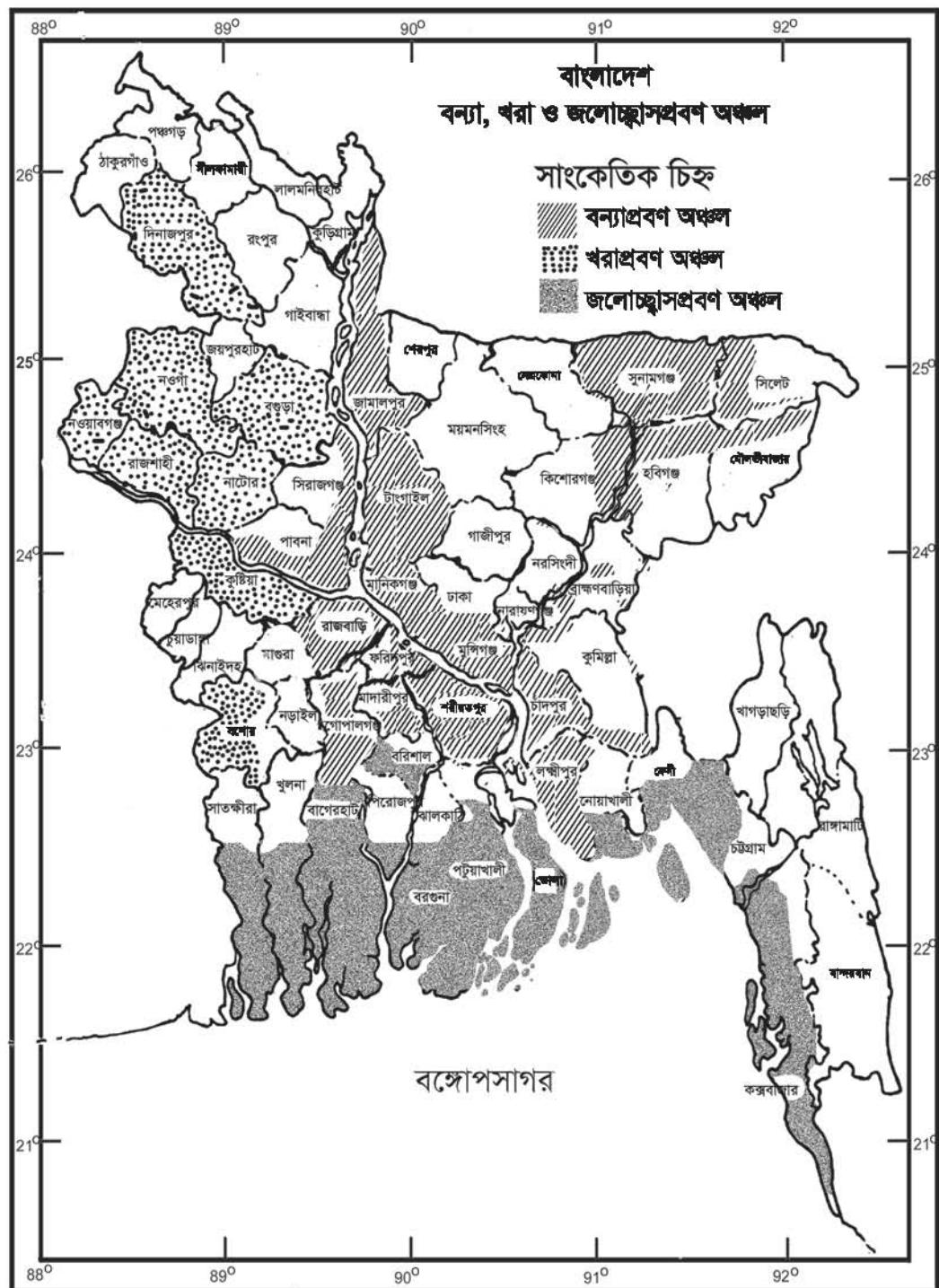
৩) নদীবাহিত বন্যা : বাংলাদেশের উজানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে সে পানি বাংলাদেশের উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। দেশের প্রধান নদ-নদীগুলো পলি পড়ে ভরাট হওয়ায় এ বিপুল পরিমাণ পানি দ্রুত পরিবহন করতে পারে না। ফলে দেশের মধ্যাঞ্চল তথা পদ্মা, মেঘনা ও ব্ৰহ্মপুত্র অববাহিকায় বন্যা হয়। বিগত ১৯৮৮, ১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালে এ অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল।

৪) উপকূলীয় ঝড়-জলোচ্ছাসজনিত বন্যা : বঙ্গোপসাগরে বড় ধরনের নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে তার প্রভাবে ঘূর্ণিঝড় হয়। ঘূর্ণিঝড়ের সাথে উপকূলীয় এলাকায় জলোচ্ছাস হয়। সাগরের লোনা পানি উপকূলীয় এলাকায় তীব্র বেগে উঁচু হয়ে প্রবেশ করে বন্যার সৃষ্টি করে। ফলে মানুষের জীবনহানিসহ ফসল, মাছ, গবাদি পশু-পাখি, ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন : বিগত সিডর ও আইলার কারণে বরিশাল ও খুলনা বিভাগের দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

খরা : শুষ্ক মৌসুমে ক্রমাগত ২০ দিন বা এর বেশি দিন ধরে কোনো বৃষ্টিপাত না হলে তাকে খরা বলে। খরার ফলে মাটিতে ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় রসের ঘাটতি দেখা দেয়। এতে ফসলের ফলন ১৫-৯০ ভাগ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। বাংলাদেশের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা অতি খরাপ্রবণ এলাকা।

কাজ : বাংলাদেশের মানচিত্রে বন্যাপ্রবণ, জলোচ্ছাসপ্রবণ এবং অতি খরাপ্রবণ অঞ্চল চিহ্নিত কর।

নতুন শব্দ : ঢল বন্যা, বৃষ্টিজনিত বন্যা, নদীবাহিত বন্যা, ঝড় জলোচ্ছাসজনিত বন্যা, খরাপ্রবণ এলাকা।



চিত্র : মানচিত্রে বাংলাদেশের বন্যা, খরা ও জলোচ্ছাসপ্রবণ অঞ্চল

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. কোনো স্থানের বছরের আবহাওয়ার গড়কে সে স্থানের জলবায়ু বলে।
২. বায়ুতে জলীয় পরিমাণকে বায়ুর আর্দ্রতা বলে।
৩. বাংলাদেশে জলবায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়।

বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বাংলাদেশের জলবায়ু	গ্রিনহাউস প্রভাব।
২. আবহাওয়া	বৃষ্টিপাত।
৩. জলবায়ু পরিবর্তন	আবহাওয়ার উপাদান।
৪. তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ইত্যাদি	সমভাবাপন্ন।
৫. বাংলাদেশের পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বৃদ্ধি পায়	দৈনিক পরিবর্তনশীল।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশকে কয়টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল হিসাবে ভাগ করা হয়েছে?
২. বাংলাদেশে কয় ধরনের বন্যা হয়ে থাকে?
৩. বাংলাদেশের বৃষ্টিপাতের ধরন কেমন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. জলবায়ুর উপাদানগুলো বর্ণনা কর।
২. কৃষিকাজে আবহাওয়া ও জলবায়ুর গুরুত্ব উল্লেখ কর।
৩. মানচিত্র এঁকে যেকোনো তিটি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল চিহ্নিত কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি আবহাওয়ার উপাদান?

ক. সমুদ্রশ্রেণী	খ. সৌরবিকিরণ
গ. বারিপাত	ঘ. ভূমির বন্ধুরতা

২. জলবায়ু-

- i. ধীরে পরিবর্তনশীল
- ii. মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত
- iii. মাটির গুণাবলিতে প্রভাব ফেলে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মৌরুসি তার মায়ের সাথে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দেখল তাদের জমিতে তার চাচা মসুর ডাল ও তিসির চাষ করেছে।

৩. মৌরুসি কোন খাতুতে বেড়াতে গিয়েছে?

- | | |
|-------------|---------------|
| ক. বর্ষাকাল | খ. গ্রীষ্মকাল |
| গ. শীতকাল | ঘ. শরৎকাল |

৪. ঐ সময়ে জলবায়ুর অবস্থা কেমন থাকবে?

- | |
|----------------------------------|
| ক. কম জলীয়বাস্প ও বৃষ্টিহীন |
| খ. যথেষ্ট গরম ও প্রচুর বৃষ্টিপাত |
| গ. হঠাতে ঝড় ও ঘূর্ণিঝড় |
| ঘ. সমুদ্রে নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড় |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জয়স্ত সেন তার বসতবাড়ির বাগানে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি উৎপাদন করেন। তার মেয়ে কোয়েল এ বছর চৈত্র মাসে শখ করে কিছু সরিষার বীজ বপন করে। বীজ অঙ্কুরিত হলেও কয়েক দিন পর চারাগুলো মরে যায়। কিন্তু তার বাবার লাগানো অন্যান্য শাকসবজি যেমন : চিচিঙ্গা, পটল খুবই ভালো উৎপাদন হয়। এ ব্যাপারে জয়স্ত সেনের কাছে কোয়েল জানতে চাইলে তিনি বললেন, ফসল উৎপাদনের জন্য মৌসুম সম্পর্কে জ্ঞান খুবই প্রয়োজন।

- | |
|---|
| ক. জলবায়ু কাকে বলে? |
| খ. জমি চাষ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল ব্যাখ্যা কর। |
| গ. কোয়েলের লাগানো চারাগুলো মরে যাওয়ার কারণ বর্ণনা কর। |
| ঘ. ফসল উৎপাদন সম্পর্কিত কোয়েলের বাবার মতামতটি বিশ্লেষণ কর। |

২. সাদিয়া তার মামার বাড়িতে বেড়াতে গেল। মামার বাড়িটি শিল্প এলাকায় অবস্থিত। খুবই ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বড় বড় বিল্ডিং আর গাড়ি ছাড়া তেমন কিছু নেই। প্রচণ্ড গরমে সে অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। তার নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে তার বাবা পরিবেশ বিশেষজ্ঞ আনোয়ার সাহেবের সাথে কথা বললে তিনি বললেন, এই এলাকার মানুষের অসচেতনতাই এর জন্য দায়ী।

- ক. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কখন থাকে?
- খ. বাতাসের আর্দ্রতাই বৃষ্টিপাতের কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. মামার বাড়িতে সাদিয়ার অস্বস্তিবোধ করার কারণ বর্ণনা কর।
- ঘ. সাদিয়ার মামার এলাকাটিকে কীভাবে পরিবেশদূষণের হাত থেকে রক্ষা করা যায় মতামত দাও।

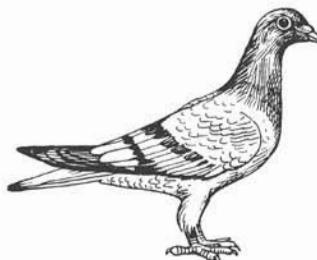
পঞ্চম অধ্যায়

কৃষিজ উৎপাদন

কৃষিজ উৎপাদন বলতে ফসল, গৃহপালিত পশু-পাখি এবং মাছ উৎপাদনকে বোঝায়। এই অধ্যায়ে উদ্যান ও মাঠ ফসল, গৃহপালিত পশু-পাখি এবং চাষযোগ্য মাছের পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি শাকসবজি উৎপাদন (লালশাক, টমেটো ও মরিচ), পাখি পালন (কুড়াতর) এবং মাছ চাষ (পাঞ্চাশ) পদ্ধতির কলাকৌশল বর্ণনা করা হয়েছে।



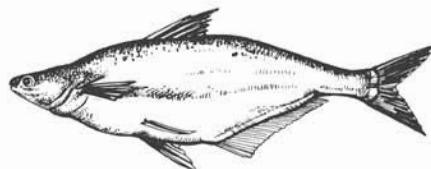
চিত্র : টমেটো



চিত্র : কুড়াতর



চিত্র : মরিচ



চিত্র : পাঞ্চাশ

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- উদ্যান ফসলের বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- মাঠ ফসলের বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- শাকসবজি উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- চাষযোগ্য মাছের বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- মাছ চাষ পদ্ধতি (পাঞ্চাশ) বর্ণনা করতে পারব।
- গৃহপালিত পশু-পাখির বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- পাখি পালন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- বসতবাড়ি কিংবা বাড়ির আঙিনায় কৃষিজ দ্রব্য (শাকসবজি) উৎপাদন করতে পারব।
- কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনে আগ্রহী হব।

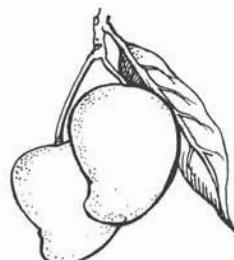
পাঠ- ১ : উদ্যান ফসলের পরিচিতি ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মানুষ তার প্রয়োজনে যেসব উদ্ভিদ চাষ করে, তাদেরকে ফসল বলে। কৃষিবিজ্ঞানে ফসলকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়, যথা- উদ্যান ফসল এবং মাঠ ফসল। উদ্যান অর্থ বাগান। আমরা বসতবাড়ির আশেপাশে উচু জমিতে ফল, ফুল, শাকসবজি ইত্যাদি ফসলের বাগান করি। বাগানে যেসব ফসল ফলানো হয়, তাদেরকে উদ্যান ফসল (Garden crops) বলে। বর্তমানে বাণিজ্যকরভাবে মাঠেও উদ্যান ফসল চাষ করা হয়। উদ্যান ফসলকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

- ১। ফল -আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, কুল, বেল ইত্যাদি।
- ২। শাকসবজি- গোলআলু, বেগুন, টমেটো, শিম, লাউ, পালংশাক ইত্যাদি।
- ৩। মশলা - মরিচ, পেয়াজ, আদা, হলুদ ইত্যাদি।
- ৪। ফুল -গাঁদা, গোলাপ, জবা, টগর, বেলি, কসমস, ডালিঙা ইত্যাদি।



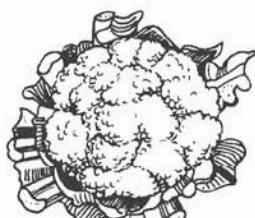
চিত্র : কাঁঠাল



চিত্র : আম



চিত্র : লিচু



চিত্র : মুলকপি



চিত্র : রসুন



চিত্র : গোলাপ ফুল

কাজ : বাংলাদেশে জন্মে এমন ফল, শাকসবজি ও ফুলের তালিকা তৈরি কর।

উদ্যান ফসলের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্য ফসল থেকে এদেরকে আলাদা করেছে। উদ্যান ফসল অল্প পরিসরে নিবিড়ভাবে চাষাবাদ করা হয়। অর্থাৎ এসব ফসল চাষে একক জাহাগীয় অধিক পুঁজি ও শ্রম দরকার হয়। মানুষের খাদ্য, ঔষধ ও সৌন্দর্য তত্ত্বাতে মেটানোর জন্য চাষ করা হয়। খাদ্যের জন্য চাষ করা উদ্যান ফসলে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ বেশি থাকে। সচরাচর তাজা অবস্থায় খাওয়া হয় এবং বেশিরভাগ রসাল ও পচলশীল। এসব ফসলের বাহ্যিক চেহারা ও শাদ মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্যান ফসলের বৈশিষ্ট্যগুলো জানার পর আমরা নিচয় উদ্যান ফসলের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা করতে পারছি। অন্ন জমিতে বেশি লাভ উদ্যান ফসলের প্রধান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য। নিচের বিষয়গুলো থেকে উদ্যান ফসলের গুরুত্ব সহজে বোঝা যাবে।

১। পুষ্টি ও পারিবারিক গুরুত্ব : বিশ্বসাহ্য সংস্থার মতে, একজন ব্যক্তিকে দৈনিক ৪৫০ গ্রাম শাকসবজি ও ফল খাওয়া উচিত। বসতবাড়ির চারপাশে উদ্যান ফসল চাষ করে পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটানো যায়। বাড়ি ফসল বিক্রি করে পরিবারের আয়ও বাড়ানো যায়। অপরদিকে আম, জাম, কাঠাল ইত্যাদি ফলের গাছ থেকে দামি কাঠ পাওয়া যায়। এসব কাঠ ঘর-বাড়ি ও আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। কাঠ বিক্রি করে অনেক অর্থ পাওয়া যায়। তাছাড়া বিভিন্ন ফলদ ও সৌন্দর্যবর্ধনকারী বৃক্ষের ডালপালা ছাঁটাই করে প্রচুর জ্বালানি পাওয়া যায়। পরিবারের রান্নাবান্নার কাজে এসব জ্বালানি ব্যবহার করা হয়। ফলে জ্বালানি খাতে অর্থ সাশ্রয় হয়।

২। অর্থনৈতিক গুরুত্ব : দেশে-বিদেশে উদ্যান ফসলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে আমরা শাকসবজি, ফল, ফুল ফসল থেকে বেশি লাভ করতে পারি। অন্যদিকে উদ্যান ফসল চাষাবাদে নিবিড় পরিচার্যার প্রয়োজন হয়। উৎপাদন থেকে বাজারজাতকরণ প্রতিটি স্তরে অধিক পুঁজি, শ্রম ও প্রযুক্তির দরকার হয়। এতে করে সারা বছর কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে বেকার সমস্যা দূর করা যায়। তাছাড়া আম, আনারস, টমেটো, পেয়ারা, লিচু, আলু, কলা ইত্যাদি ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাত করে জ্যাম, জেলি, আচার, জুস, সস, চিপস তৈরি করে বেশি দামে বিক্রি করা যায়। এসব তৈরির জন্য ছেট ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলা যায়।

নতুন শব্দ : উদ্যান ফসল, মাঠ ফসল।

পাঠ- ২ : মাঠ ফসলের পরিচিতি ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

আগের পাঠে আমরা উদ্যান ফসল সম্পর্কে জানতে পেরেছি, এ পাঠে আমরা মাঠ ফসল সম্পর্কে জানব। মাঠ ফসলকে ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে ছয় ভাগ করা যায় ; যথা-

১। দানা ফসল- ধান, গম, ভূটা ইত্যাদি।

২। ডাল ফসল- মসুর, মুগ, ছোলা, খেসারি ইত্যাদি।

৩। তেল ফসল- সরিষা, তিল, সূর্যমুখী ইত্যাদি।

৪। আঁশ ফসল- পাট, তুলা, মেন্তা ইত্যাদি।

৫। চিনি ফসল- আখ, সুগারবিট ইত্যাদি।

৬। পশুখাদ্য (Fodder crops) ফসল- ফেলন, গিনি, প্যারা, নেপিয়ার ইত্যাদি।



চিত্র : খান



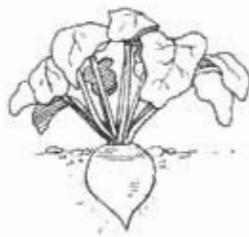
চিত্র : হোলা



চিত্র : সূর্যমুখী



চিত্র : কার্পেস হুলা



চিত্র : সুগাৰবিট



চিত্র : দেশিৱাৰ খাস

মাঠ ফসলের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা উদ্যান ফসল থেকে এদেরকে আলাদা করেছে। মাঠ ফসল বৃহত্তর পরিসরে চাষাবাদ করা হয়। উদ্যান ফসলের মতো নিবিড়ভাবে চাষাবাদের অযোগ্য হয় না। মানুষ ও পশুর খাদ্যের জন্য চাষ করা হয়। স্বাক্ষর পচনশীল নয়।

মাঠ ফসলের পরিচয় জ্ঞানীর পর, আমরা নিচ্ছ এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে অনুমান করতে পারছি। দানা, ডাল ও তৈল ফসল আমাদের খাদ্যশস্য ফসল। দানা জাতীয় ফসলের মধ্যে খান, পম, জুটা মানুষের খাদ্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ডাল জাতীয় ফসল আমাদের আমিষের চাহিদা মেটায়। বিভিন্ন তৈল জাতীয় ফসল থেকে আমরা ভোজ্যতেল পাই।

পম, জুটা ও ডাল ফসল পশ্চ, পাখি ও মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পবাদি পশ্চ খাদ্যের অন্য প্রয়োগ, লিনি, লেপিয়ার, খেসার চাষ করা হয়। একস্থে সবুজ অবস্থার খাওয়ানো হয়। এর কলে বাণিজ্যিকভাবে পশ্চ, পাখি ও মাছ চাষ হস্তান করেছে।

আখ, সুগাৰবিট থেকে চিনি তৈরি করা হয়। আমাদের দেশে আখচাবিৰা চিনি কলে আখ সংস্কৰণ করে নথন অৰ্থ পেঁয়ে থাকেন।

আশ ফসল থেকে সূতা, কাশক, সড়ি, বক্তা, কাশেটি ইত্যাদি তৈরি হয়। আমাদের দেশে আশ ফসলের মধ্যে পাট অন্যতম। দেশে-বিদেশে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিদেশে ব্রহ্মানি করে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মূল্য অর্জন করে থাকি।

কাজ : এখানে বলা হয়নি এমন কম্পেক্ট মাঠ ফসলের নাম লেখ ও ব্যবহার উল্লেখ কর।

নতুন শব্দ : দানা ফসল, আঁশ ফসল, পাণি খাদ্য ফসল।

পাঠ- ৩ : লালশাক উৎপাদন পদ্ধতি

আমাদের দেশে লালশাক একটি জনপ্রিয় শাক। বাংলাদেশের আয় সব এলাকায় কম বেশি লালশাকের চাষ হয়। এতে প্রচুর ভিটামিন আছে।

মাটি : প্রায় সব ধরনের মাটিতেই সারা বছর লালশাক আবাদ করা যায়। তবে দোআশ ও বেলে-দোআশ মাটি চাষের জন্য উচ্চ। আমাদের দেশে শীতের শুরুতে লালশাকের ফলন বেশি হয়। গরমকালে উচ্চ জমিতে লালশাক চাষ করা যায়।

জাত : লালশাকের অনেক জাত রয়েছে। তবে উন্নত দুটি জাত হলো- আলতাপাটি এবং বারি লালশাক-১। আলতাপাটি জাতটির পাতা ও কাণ্ড সিদুর লাল। বারি লালশাকের-১ পাতা ও কাণ্ড লাল হয়। এ শাকের ফুল লাল এবং বীজ গোলাকার হয়।

জমি তৈরি : লালশাকের বীজ খুব ছোট। তাই ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে জমি ঝুরিবুরা করে তৈরি করতে হবে। লালশাক একটি স্থলকালীন ফসল। তাই শেষ চাষের সময় প্রতি শতক জমিতে গোবর সার ৪০ কেজি, ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ গ্রাম টিএসপি এবং ২৫০ গ্রাম এমপিসি সার প্রয়োগ করতে হবে। চারা গজানোর ৭ দিন পর শতকপাতি ৪০০ গ্রাম অতিরিক্ত ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

বীজ বগন : লালশাকের বীজ ছিটিয়ে ও সারিতে বগন করা যায়। সারিতে বগন করলে পরিচর্যা করা সুবিধাজনক এবং ফলনও বেশি হয়। বর্ষার সময় চাষ করলে এক মিটার চওড়া এবং ১৫ সেমি উচ্চ বেড় করে বীজ বগন করতে হয়। সেক্ষেত্রে দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি সেচ নালা রাখতে হয়। বগনের সময় বালির সাথে মিশিয়ে বগন করলে বীজ সব জায়গায় সমভাবে পড়তে পারে। প্রতি শতক জমিতে ১০ গ্রাম বীজ হলেই চলে। সারিতে বগন করলে, ২০ সেমি দূরে দূরে কাটির সাহায্যে ১.৫-২.০ সেমি গভীর করে লাইন টেনে লাইনে বীজ ছিটিয়ে মাটি সমান করে দিতে হবে।

আঙ্গঃপরিচর্যা : বীজ বগন বা চারা রোপণের পর থেকে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত যেসব পরিচর্যা করা হয়, তাকে আঙ্গঃপরিচর্যা বলে। বগনের সময় মাটিতে বীজ গজানোর মতো পর্যাপ্ত রস অর্থাৎ জো ধাকলে সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে জো না ধাকলে বগনের পর পর জমিতে সেচ দিতে হবে। বীজ গজানোর এক সন্তান পর প্রত্যেক সারিতে ৫ সেমি অন্তর গাছ রেখে অন্যান্য গাছ তুলে পাতলা করতে হবে। নিম্ননি দিয়ে আগাছা পরিকার করতে হবে এবং সেচের পর মাটির ঢাটা তেজে দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ : বীজ বগনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে লালশাক সংগ্রহ শুরু করা যায়। প্রথম দিকে বড় গাছগুলো তুলতে হবে। এভাবে দুই-তিন দিন পর পর শাক তোলা যেতে পারে। শিকড়সহ লালশাকের গাছ তোলা হয়। তোলার পর পানিতে ধূঘে আটি বেঁধে বাজারজাত করা হয়। কাণ্ড শক্ত হওয়ার আগেই শাকের জন্য ফসল সংগ্রহ শেষ করতে হবে।



চিত্র : লালশাক

কাজ : পৌঁছ শতক অধিতে লালশাক চাষের জন্য কী কূবি উপকরণ প্রয়োজন হয়, তাৰ একটি ভালিকা তৈরি কৰ।

সমূল শব্দ : উপরি প্রয়োগ, বেড়ে চাষ, মাটিৰ জো, আন্তঃপরিচর্যা।

গাঠ- ৪ : মরিচ উৎপাদন গজতি

বাংলাদেশে মরিচ একটি মসলা বসল। বালেৰ জন্য কাঁচা ও পাকা মরিচ ব্যবহাৰ কৰা হয়। কাঁচা মরিচে ভিটামিন 'বি' বেশি থাকে। বৰ্তমানে বালাইস এক ধৰণেৰ মরিচও পাওৱা যায়। একে কেপসিকাম মরিচ বলে। এই মরিচ সালাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

আক : বাংলাদেশেৰ বিভিন্ন আলাকায় মরিচেৰ অনেক আক ছফ্টিৱে বৱেছে। **বেমল :** বিদু, চম্পিৰা, ধানী, উবদা, চট্টোয়, কুমিলা, বঙ্গু ইত্যাদি। এ ছাড়া বালা লকা (বাৰি মরিচ-১) নামেৰ অনুমোদিত জাতটি সামা বহু চাষেৰ উপযোগী।



চিত্র : বাল মরিচ

মাটি : পানি নিকাশেৰ সুবিধাবুক্ত বেলে-দোআঁশ থেকে এণ্টেল-দোআঁশ মাটিতে মরিচ ভালো হয়। তবে জৈব গদাৰ্থ সমূহ দোআঁশ বা পলি-দোআঁশ মাটি মরিচ চাষেৰ জন্য উপযুক্ত। মরিচগাছ জলাবদ্ধতা সহ কৰতে পাৰে না।



ৰোপণ সময় : রবি মৌসুমে সেল্টেবৰ-অক্টোবৰ ঘাস বীজ বশনেৰ উপযুক্ত সময়। খৱিল মৌসুমে ডিসেম্বৰেৰ প্ৰথম সপ্তাহ থেকে বেজুগারিৰ প্ৰথম সপ্তাহ পৰ্যন্ত বীজতলায় বীজ বশন কৰা যায়। চাৰাৰ ৪-হাতি পাতা গজালে মাঠে ৰোপণেৰ উপযুক্ত হয়।

চিত্র : কেপসিকাম মরিচ

বীজ হার, বশন ও ৰোপণ দূৰত্ব : সুবাসিৰ মূল জমিতে বীজ বশন কৰলে হাতি শতক জমিৰ জন্য ১২-১৬ আম বীজ লাগে। বীজতলায় চাৰা তৈৰি কৰে লাগালে এৱং অৰ্দেক বীজ লাগে। রবি মৌসুমে চাৰা এমনভাৱে রাখতে হবে, যেন সাবি থেকে সাবি ২৫ সেমি এবং গাছেৰ দূৰত্ব ২০ সেমি হয়। খৱিল মৌসুমে মূল জমিতে ৪৫×৪৫ সেমি দূৰে দূৰে চাৰা ৰোপণ কৰতে হবে।

বীজতলা তৈৰি : সাধাৰণত রবি মৌসুমে সুবাসিৰ মূল জমিতে বীজ বশন এবং খৱিল মৌসুমে প্ৰথমে বীজতলায় চাৰা তৈৰি কৰে পৰে মূল জমিতে ৰোপণ কৰা হয়। বীজতলার আকাৰ ও মিটাৰ ১১ মিটাৰ (দৈৰ্ঘ্যম্বৰ্ত্তী) বাধা হয় এবং ১৫ সেমি উঁচু কৰা হয়। বীজতলায় উপৱেৰ মাটি ১১১১ অনুপাতে বালি, মাটি ও পোৰ সাবি মিশিয়ে সুবিধাবুক্ত কৰে নিতে হয়। পোৰন্তৰণ বীজ ৫ সেমি দূৰে দূৰে সাবি কৰে ২-৩ সেমি পঞ্চিৰে বশন কৰাতে হয়। বীজকে পিপড়াৰ হাত থেকে মুক্ত কৰে বীজতলায় চাৰাবাবে সেতিস ভাস্ত ছিটিয়ে দিতে হবে। ৭-১০ দিনেৰ মধ্যে চাৰা গজায়। বীজ বশনেৰ পৰি অভিবৃতি বা অৰ্থাৎ ঝোদ থেকে রক্ষা পেতে পলিথিন বা বাঁকুনি ছাউলি দিয়ে বীজতলা ঢেকে দিতে হয়। অয়োজন অনুযায়ী বীজতলাৰ সকালে বা বিকালে হালকা সেচ দিতে হবে। চাৰাৰ ৪-হাতি পাতা গজালে মাঠে ৰোপণেৰ উপযুক্ত হয়।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ : ৪-৬টি চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে তৈরি করতে হবে। শেষ চাষের সময় শতকপ্রতি ৪০ কেজি গোবর সার, ১২০০ গ্রাম টিএসপি, ৫৪০ গ্রাম এমওপি, ৪৪০ গ্রাম জিপসাম সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। অতঃপর সরাসরি বীজ বপন বা চারা রোপণের জন্য ১ মিটার চওড়া ও লম্বায় জমির আয়তন অনুসারে বেড় তৈরি করতে হবে। পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য বেডগুলো ১৫ সেমি উচ্চ এবং দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি চওড়া নালা রাখতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা : জমি সব সময় আগাছাযুক্ত রাখতে হবে। ইউরিয়া ও এমওপি সার চারা রোপণের ২০, ৪০ ও ৬০ দিন পর ৩ বার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবারে শতক প্রতি ২৮০ গ্রাম ইউরিয়া সার গাছের গোড়া থেকে ১০-১৫ সেমি দূরে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। শীত ও খরার সময় সেচের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া প্রতি কিণ্ঠি সার প্রয়োগের পর সেচ দেওয়া প্রয়োজন। সেচের কয়েক দিন পর মাটিতে চটা দেখা গেলে ভেঙ্গে দিতে হবে।

কাজ : মরিচের বীজতলা সম্পর্কে একটি পোস্টার তৈরি কর।

পাঠ- ৫ : মরিচের রোগ ও পোকামাকড় দমন

রোগ দমন : মরিচে চারা অবস্থায় ড্যাম্পিং অফ রোগ হতে পারে। এ রোগ দমনের জন্য এক কেজি বীজ ৩ গ্রাম প্রোভেলের সাথে মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। বীজতলা শুকনা রাখতে হবে। মরিচ গাছ অনেক সময় আগা থেকে গোড়ার দিকে ত্রুমাস্থে শুকিয়ে মারা যায়। একে ডাইব্যাক রোগ বলে। এ রোগ দমনের জন্য ১ গ্রাম ব্যারিস্টিন ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হয়। হলুদ মোজাইক ডাইরাস রোগ দমনের জন্য আক্রান্ত গাছ দেখায়াত্ত তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগ প্রতিরোধী জাতের মরিচ চাষ করতে হবে।



চিত্র : মরিচের মড়ক রোগ

পোকামাকড় দমন : এক ধরনের ক্ষুদ্র মাকড়ের আক্রমণে চারা গাছের পাতা কুঁকড়িয়ে যায়। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম থিওভিট মিশিয়ে ১০ দিন পর পর স্প্রে করে মাকড় দমন করা যায়। ত্রিপস ও জাবপোকার আক্রমণ দেখা দিলে ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি ১ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। ফসল সংঘর্ষের সময় কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক ব্যবহার না করাই ভালো। ব্যবহার করলেও ৫-৭ দিন ফসল সংঘর্ষ বন্ধ রাখা উচিত।



চিত্র : জাব পোকার বাঢ়া

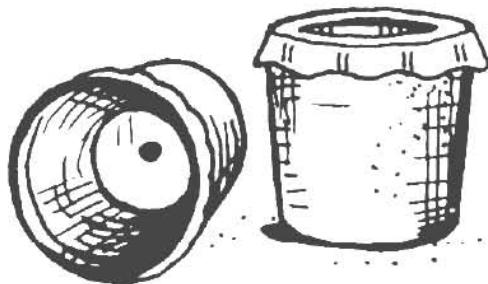
ফসল সংঘর্ষ : চারা রোপণের ৩০-৪০ দিন পর গাছে ফুল আসা শুরু হয়। কাঁচা মরিচ পরিপন্থ হতে ২৫-৩০ দিন সময় লাগে। মরিচ পাকতে আরো ২৫-৩০ দিন সময় লাগে। কাঁচা মরিচ সংঘর্ষে ২-৩ বার এবং পাকা মরিচ ১৫ দিন পর প্রায় ২-৩ মাস সংঘর্ষ করতে হয়।

ফলন : জাতভেদে ফলনে তারতম্য হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে কাঁচা মরিচ উৎপাদন করলে গড়ে ৬-১০ টন ফলন পাওয়া যায়। তবে শুকনা মরিচ উৎপাদন করলে ১.৫-২.৫ টন ফলন হয়।

টবে মরিচ চাষ পদ্ধতি

এতক্ষণ আমরা মাঠে মরিচ চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানলাম। এখন আমরা টবে কীভাবে মরিচ চাষ করতে হয় সে সম্পর্কে জানব। টবে মরিচ চাষ করতে হলে প্রথমে ৬-১০ ইঞ্চি ব্যাসের মাটির বা প্লাস্টিকের টব নিতে হবে। টবের মাটি তৈরি করার জন্য দোআঁশ মাটি এক ভাগ, বেলে মাটি এক ভাগ এবং গোবর সার এক ভাগ নিয়ে ভালো ভাবে মেশাতে হবে। এবার টবের নিচের ছিদ্রের উপর হাঁড়ি বা কলসি বা ইটের টুকরো বসাতে হবে। যাতে অতিরিক্ত পানি চুইয়ে বের হয়ে যেতে পারে। মেশানো মাটি দিয়ে টব ভর্তি করতে হবে। অন্ততকৃত টবে মরিচের চারা রোপণ করে হালকাভাবে ঝাঁঝাই দিয়ে পানি সেচ দিতে হবে। সারা দিনে অন্তত ৬-৭ ঘণ্টা সূর্যের আলো পাওয়া এমন জায়গায় টব বসাতে হবে। তবে চারা লাগানোর প্রথম কয়েক দিন টব দুপুরের সময় ছায়ায় রাখতে হবে।

টবে মরিচ চাষের ক্ষেত্রে কম্পোষ্ট বা গোবর সার ব্যবহার করাই ভালো। সারের অভাব হলে টবের উপরের মাটি সাদা হয়ে যায়, মাটিতে রসের অভাব দেখা যায়। এ রকম হলে নিড়ানি দিয়ে টবের মাটি আলগা করে সার মিশিয়ে দিতে হবে। টবে এমনভাবে পানিসেচ দিতে হবে, যেন পানি জায়ে না যায়। টবে ঘন ঘন পানিসেচ দিতে হয় বলে উপরের মাটি শক্ত হয়ে যায়। এ জন্য কয়েক দিন পর পর নিড়ানি দিয়ে আলগা করে দিতে হবে।



চিত্র : ছিদ্রযুক্ত মাটির টব



চিত্র : টবসহ মরিচ গাছ

কাজ : টবে কী কী শাকসবজি চাষ করা যায় তার একটি ভালিকা তৈরি কর।

পাঠ- ৬ : টমেটোর উৎপাদন পদ্ধতি

টমেটো ভিটামিন এ, বি এবং সি সমৃক্ষ একটি সবজি। কাঁচা ও পাকা টমেটো রান্না এবং পাকা টমেটো সালাদ হিসাবে জনপ্রিয়। তাছাড়া পাকা টমেটো প্রয়োজনীয়ত করে তৈরি সস প্রস্তুত করে। টমেটো মূলত শীতকালীন সবজি। তবে বর্তমানে আবেগেও চাব করা যায়।



চিত্র : টমেটো গাছ



চিত্র : টমেটো সংগ্রহ

জাত : বাংলাদেশে টমেটোর অনেক অনুমোদিত জাত রয়েছে। শীতকালীন জাতের মধ্যে রয়েছে - বাবি টমেটো-২ (রক্ত), বাবি টমেটো-৯ (শালিমা), বাবি টমেটো-১০ (অনুপমা), বিলা টমেটো-৩ এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা জাত মারগ্রোব, কুমা ভিএফ, অক্রহার্ট ইভ্যানি। শীতকালীন জাতের মধ্যে রয়েছে- বাবি টমেটো-৪, বাবি টমেটো-৫, বাবি টমেটো-৯ (শালিমা), বাবি টমেটো-১০ (অনুপমা), বাবি টমেটো-১১ (মুখুকা), বাবি হাইব্রিড টমেটো-৩, বাবি হাইব্রিড টমেটো-৪ ইভ্যানি।

মাটি : আলো-বাজাসমূক উর্বর দোআংশ মাটি টমেটো চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো। কবে উপরূপ পরিচর্যার বেলে-দোআংশ থেকে এণ্টেল-দোআংশ সব মাটিতেই টমেটো ভালো জন্মে।

চারা উৎপাদন পদ্ধতি : প্রতি হেক্টের টমেটো চাষের জন্য ২০০ ক্রাম বীজ প্রয়োজন। প্রথমে ৪টি বীজতলার (৩ মিটার \times ১ মিটার) ৫০ ক্রাম করে বীজ বন করে বুনতে হয়। বীজ গজানোর ৮-১০ দিন পরে চারা ফুলে হিতীর বীজতলায় ৪ \times ৪ সেমি দূরে দূরে রোপণ করতে হয়। সেকেতে ২২টি বীজতলার প্রয়োজন হয়। এতে করে সবল চারা পাওয়া যায়। শীতকালীন জাতের জন্য সেক্টেবর-অক্টোবর মাস বীজ বপনের উপরূপ সময়।

জমি তৈরি ও সার পরোপ্ত : ৪-৫ বার চাব ও মাই মিয়ে মাটি মুরগুরে করে নিতে হবে। মাটিয়ে প্রকৃতি ও স্থানতে দে ১ মিটার চওড়া ও ১৫-২০ সেমি উচ্চ বেত তৈরি করতে হবে। সূচি বেতের মাঝে ৩০ সেমি চওড়া সেচ নালা রাখতে হবে, যাকে পানিসেচ ও নিকাশনের সুবিধা হবে। টমেটো চাষের জন্য সার প্রয়োগের পরিমাণ হচ্ছে-

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	২.০-২.৫ কেজি
টিএসপি	১.৫-২.০ কেজি
এমওপি	০.৮-১.২ কেজি
গোবর সার	৩০-৫০ কেজি

শেষ চাষের আগে সম্পূর্ণ গোবর, সব টিএসপি এবং তিন ভাগের দুই ভাগ এমওপি সার ভালোভাবে মাটির সাথে মিলিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার সমান ও কিন্তিতে চারা লাগানোর ১০ দিন, ২৫ দিন ও ৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। বাকি এমওপি সার দুই ভাগে করে ২৫ দিন ও ৪০ দিন পর দিতে হবে।

চারা রোগণ : চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে রোগনের উপযোগী হয়। বীজতলা থেকে চারা অভ্যন্ত যত্ন সহকারে তুলতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এজন্য চারা তোলার আগে বীজতলার মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে। বিকেলের পড়স্ত রোদে চারা রোগণ করাই উত্তম। রোগনের পর হালকা সেচ দিতে হবে। এক মিটার চওড়া বেড়ে দুই সারি করে চারা লাগাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪০ সেমি রাখতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা : জমিকে নিয়মিত আগাছামুক্ত রাখতে হবে। চারা রোগনের প্রথম ৩-৪ দিন হালকা সেচ দিতে হবে। পরবর্তীকালে মাটিতে রসের অভাব হলে সেচ দিতে হবে। সেচ অথবা বৃষ্টির কারণে জমিতে অতিরিক্ত পানি জমলে তা বের করে দিতে হবে। প্রথম ফুলের গোছার ঠিক নিচের কুশিটি ছাড়া সব পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করতে হবে। গাছে বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠেকনা দিতে হবে।

কাঞ্জ : বসতবাড়ির আঙ্গিনায় কী কী শাকসবজি চাষ করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

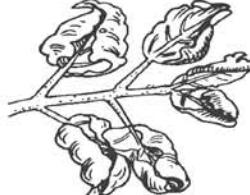
পাঠ- ৭ : টমেটোর রোগ ও পোকা দমন

ড্যাপ্টিং অক রোগ : ছত্রাকজনিত এ রোগে চারার গোড়ায় পানি ভেজা দাগ পড়ে ও পচে যায়। অনেক সময় শিকড় পচেও চারা মারা যায়। আক্রান্ত জায়গায় রিভোমিল গোল্ড দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে।

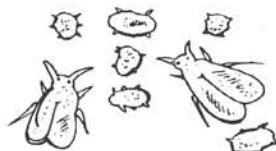
চলে পড়া রোগ : ব্যাকটেরিয়াজনিত এ রোগে গাছ ঘেকোনো সময় চলে পড়ে ও দ্রুত মারা যায়। আক্রান্ত গাছ দেখলেই তা তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করতে হবে।



চিত্র : চলে পড়া রোগ



চিত্র : হলুদ পাতা কুঁকড়ানো রোগ



চিত্র : সাদা মাছি

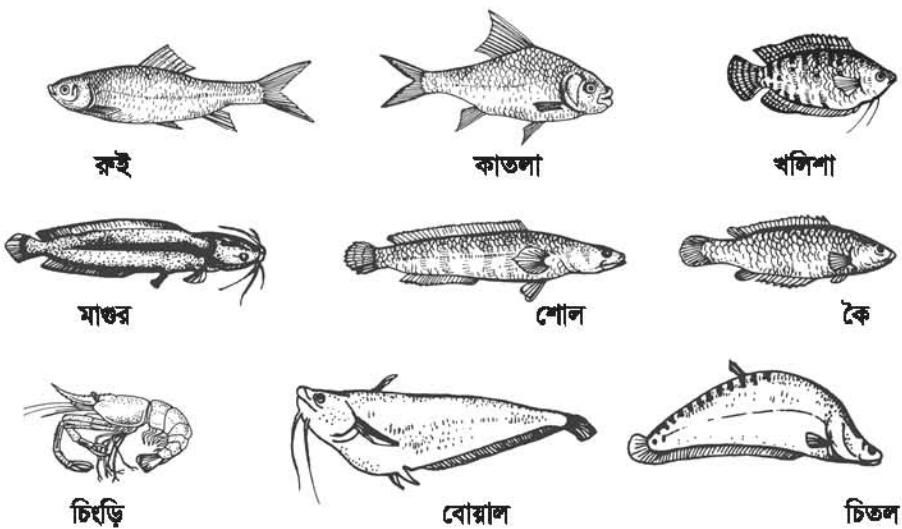
হলুদ পাতা কুঁকড়ানো রোগ : ভাইরাসজনিত এ রোগে পাতা কিনারা থেকে মধ্যশিরার দিকে গুটিয়ে যায়। পাতা খসখসে হয়ে শিরাগুলো স্বচ্ছ হলুদ হয়ে কুঁকড়িয়ে যায়। আক্রান্ত পাতের ডগায় ছোট ছোট পাতা শুচ্ছ আকার ধারণ করে। এ রোগ দমনের জন্য টমেটো ক্ষেত আগাছামুক্ত রাখতে হবে, রোগমুক্ত চারা সাগাতে হবে, আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সাদা মাছি পোকা এ রোগের দ্রুত বিস্তার ঘটায়। মাছি পোকা দমনের জন্য ৭-১০ দিন পর পর এডমারার নামক কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।

ফল সংরক্ষণ : সাধারণত চারা রোগগের দুই মাস পর হতে টমেটো পাকা শুরু করে। জাতভেদে টমেটোর জীবনকাল ১২০-১৫০ দিন। ফল লালচে রং ধারণ করলে বেঁটা থেকে কেটে ফল সংরক্ষণ করতে হয়। জাত ও মৌসুম ভেদে ফলনে পার্থক্য হয়। শীতকালে ২৫০ কেজি/শতক এবং গ্রীষ্মকালে ৮০-১০০/শতক ফলন হয়ে থাকে।

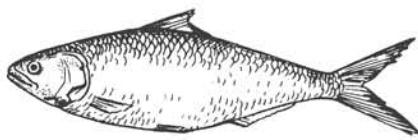
কাজ : টবে বা বাড়ির আঙিনায় টমেটোর চারা হাতেকলমে রোপণ করে, নিয়মিত পরিচর্যা করে ও অগ্রগতি শিক্ষককে জানাতে হবে।

পাঠ-৮ : বাংলাদেশের চাষবোগ্য মাছের পরিচিতি

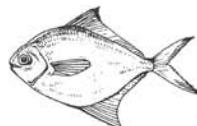
আমরা প্রতিদিন কোনো না কোনো মাছ খেয়ে থাকি। মাছ আমাদের খুবই প্রিয় খাদ্য। মাছ বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। আমাদের নদী, নালা, খাল, বিল, পুরুর, দিঘির স্বাদু পানিতে প্রাকৃতিকভাবে অনেক মাছ পাওয়া যায়। যেমন: রাই, কাতলা, মুগেল, শিৎ, পুঁটি, খলিশা, কই, চিতল, বোয়াল, চিংড়ি প্রভৃতি। অন্যদিকে আমাদের লোনা পানির বিশাল বঙ্গোপসাগরেও আছে অনেক ধরনের মাছ। যেমন: ইলিশ, ঝুঁঁপচাঁদা, লইট্যা, কোরাল, ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের মাছ উৎপাদনের পরিমাণ মানুষের চাহিদার তুলনায় অনেক কম। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাছের চাহিদা দিন দিন আরও বাঢ়ছে। আর তাই বেশি করে মাছ চাষের মাধ্যমে এ চাহিদা মেটানো সম্ভব।



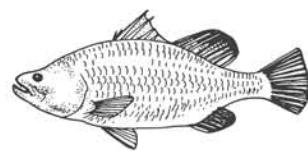
চিত্র : বাংলাদেশের কয়েকটি স্বাদু পানির মাছ



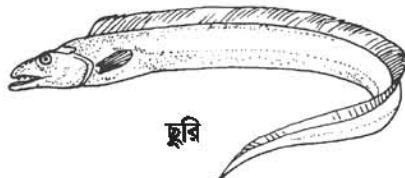
ইলিশ



রংগঢ়া



ভেটকি



চিত্র : বাংলাদেশের কয়েকটি সোনা পানির মাছ

মাছ মেরুদণ্ডী প্রাণী। এরা ফুলকার সাহায্যে খাস নেয় এবং লেজ ও পাখনার সাহায্যে চলাফেরা করে। মাছের দেহ মোটা এবং মাথা ও লেজের দিক সরু। তাই এরা সহজে ও দ্রুত পানিতে চলাফেরা করতে পারে। চিংড়ি একটি অমেরুদণ্ডী প্রাণী। চিংড়ি পানিতে বাস করে ও খেতে সুস্থানু।

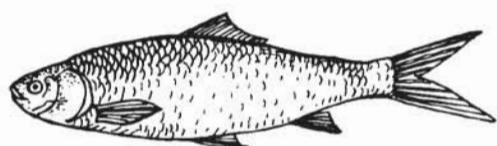
বাংলাদেশে প্রাণ মাছগুলোর মধ্যে সব মাছ আবার পুরুরে চাষ করা হয় না। দেশি চাষযোগ্য মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাটি, গলদা ও বাগদা চিংড়ি উল্লেখযোগ্য। দেশি মাছ ছাড়াও চাষের উদ্দেশ্যে কিছু বিদেশি মাছও আমাদের দেশে আনা হয়েছে। এসব মাছ এককভাবে বা আমাদের দেশি চাষযোগ্য মাছের সাথে একত্রে পুরুরে মিশ্রচাষ করা যায়। বিদেশি চাষযোগ্য মাছের মধ্যে থাই পাজাশ, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, থাই সরপুটি, তেলাপিয়া অন্যতম।

কাজ : চাষযোগ্য মাছের ভালিকা তৈরি কর এবং প্রেগন্টে উপহারণ কর।

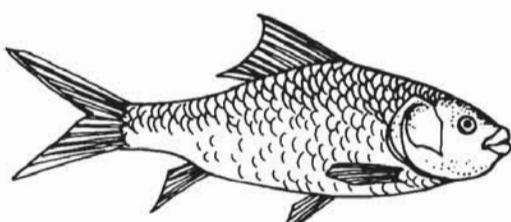
নতুন শব্দ : স্বাদুপানি, সোনা পানি, ফুলকা, মিশ্র চাষ।

পাঠ- ৯ : বাংলাদেশের চাষযোগ্য মাছের বৈশিষ্ট্য

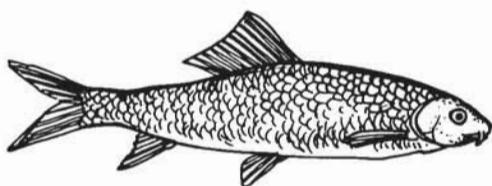
বাংলাদেশে পানিতে অনেক রকমের মাছ পাওয়া গেলেও সব মাছ পুরুরে চাষ করা যায় না। যে সকল মাছের পোনা সহজলভ্য, তাড়াতাড়ি বাড়ে, বাজারে চাহিদা ও ভালো দাম রয়েছে, পুষ্টিমান ভালো ও খেতে সুস্থানু, সে সকল মাছই পুরুরে চাষ করা হয়। তাছাড়া এসব মাছ পুরুরের প্রাকৃতিক খাবার ও বাইরে থেকে দেওয়া সম্পূর্ণ খাবার দক্ষতার সাথে হজম করতে পারে।



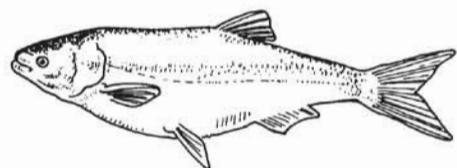
রুই



কাতলা



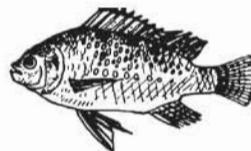
মৃগেল



সিলভার কার্প



গ্রাসকার্প



তেলাপিয়া



থাই সরপুটি

চিত্র : পুরুরে চাষযোগ্য করেকটি প্রধান মাছ

আমাদের দেশি করেকটি প্রধান চাষযোগ্য মাছ হলো রুই, কাতলা, মৃগেল। এরা সবাই নদীর মাছ। তবে পুরুরে চাষের জন্য খুব উপযোগী। প্রাকৃতিক খাদ্য ছাড়াও এরা সম্পূর্ণ খাবার খায়। বর্ষাকালে স্নোতশীল নদীতে ডিম পাড়ে। তবে বর্তমানে চাষের উদ্দেশ্যে হ্যাচারিতে পোনা তৈরি করা হচ্ছে। নিচে এদের দৈরিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো-

রুই : দেহ সম্মত আকৃতির। মাথা তুলনামূলক ছোট। ঠোট ফোলা ফোলা ও ঠোটের কিনারায় অনেক সূক্ষ্ম ঝাঁজ আছে। পিঠের দিক কিছুটা বাদামি। পেটের দিক হালকা সোনালি। বছরে ১ কেজি ওজনের হয়ে থাকে।

কাতলা : এদের মাথা বড়, দেহ চওড়া ও একটু চ্যাপটা। পিঠ উচু, মুখ উপরের দিকে বাঁকানো। এ মাছ বেশ তাড়াতাড়ি বাড়ে। ঠিকমতো খাবার পেলে দুই বছরে ৪-৫ কেজি পর্যন্ত বড় হয়।

মৃগেল : মাথা দেহের তুলনায় ছোট। মুখ কিছুটা নিচের দিকে। দেহ সম্মত, নিচের অংশ লম্বালম্বিতাবে সোজা। মুখের দুই পাশে ছোট দুই জোড়া গুঁড় আছে।

পুরুরে চাষযোগ্য বিদেশি মাছের মধ্যে সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প, তেলাপিয়া, থাই সরপুটি বর্তমানে

ব্যাপকভাবে চাষ করা হচ্ছে। নিচে এদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো :

সিলভার কার্প : এরা চীন ও রাশিয়ার নদীর মাছ। এদের মাথা ছোট, দেহের মাঝের অংশ চওড়া, সামনের ও পেছনের দিক সরু। আঁশ খুব ছোট। দেহের রং চকচকে ঝুপালি। এদের মুখ কাতলা মাছের মতো উপরের দিকে বাঁকানো।। এ দেশের চাষযোগ্য মাছের সাথে পুরুরে চাষ করা যায়। পুরুরে চাষযোগ্য বিদেশি মাছের মধ্যে সিলভার কার্প সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বাঢ়ে।

আসকার্প : এদেরও চীন এবং রাশিয়ার নদীতে পাওয়া যায়। এদের দেহ বেশ লম্বা, মাথা ছোট। দেহের রং সাদাটে ও পাথনা ছোট। এরা দ্রুত বাঢ়ে। চাষ অবস্থায় যেকোনো ঘাস বা লতাগাতা খাওয়ানো যায়।

তেলাপিয়া : থাইল্যান্ড থেকে এদের আনা হয়েছে। তেলাপিয়া বেশ খাটো এবং তুলনামূলকভাবে চওড়া আকৃতির। দেহ চ্যাপটা এবং রং ধূসর-সীলাত। এরা দ্রুত বর্ধনশীল ও খেতে সুস্বাদু। এদের সাধারণত পুরুরে এককভাবে চাষ করা হয়। এরা ৩ - ৪ মাসেই খাবার উপযোগী হয়।

থাই সরপুটি : এ মাছকে রাঙ্গপুটিও বলা হয়। এ মাছের দেহের রং উজ্জ্বল ঝুপালি। দেহ বেশ চ্যাপটা। মাথা বেশ ছোট। এদের এককভাবে বা অন্য মাছের সাথে মিশ্রচাষ করা যায়। এরাও ৩-৪ মাসে খাবার উপযোগী হয়।

কাজ : চাষযোগ্য কিছু মাছের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : সম্পূরক খাবার, হ্যাচারি।

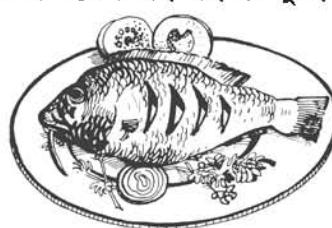
পাঠ- ১০ : চাষযোগ্য মাছের পুষ্টি ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মাছ চাষ করে আমরা আর্থিকভাবে সান্তোষ হতে পারি। মাছ সকলের নিকট খুব প্রিয় খাদ্য। অন্যান্য খাবারের সাথে সকলের দৈনিক মাছ খাওয়া উচিত। মাছের বর্তমান উৎপাদন আমাদের চাহিদার তুলনায় অনেক কম। তাই নিজেদের জলাশয়ে মাছ চাষ করে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে হবে। তাছাড়া অতিরিক্ত উৎপাদিত মাছ বাজারে বিক্রি করে নগদ অর্ধ আয় করা যায়। আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ, কাজের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন এবং সামাজিক উন্নয়নে মাছ চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে মাছের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করা হলো।

পুষ্টির চাহিদা পূরণ : আমাদের প্রতিদিনের খাবার তালিকায় আমিষের প্রধান উৎস হচ্ছে মাছ। এটি একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার। আমাদের দৈহিক বৃক্ষি ও রোগ প্রতিরোধের জন্য আমিষ দরকার। একজন পূর্ণ ব্যক্তি স্নেকের দৈনিক ৩৩ থেকে ৬৬ গ্রাম আমিষ জাতীয় খাবারের প্রয়োজন হয়। আমিষের মধ্যে প্রাণিজ আমিষ উৎকৃষ্ট মানের। কিন্তু বর্তমানে আমরা প্রাণিজ আমিষের চাহিদার তুলনায় কম খেয়ে থাকি। মাছ চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে প্রাণিজ আমিষের অভাব দূর করা সম্ভব। তাই মাছ চাষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।



চিত্র : রাই মাছের কারি



চিত্র : তেলাপিয়া ফ্রাই

কাজ : পুঁটির চাইদা পূরণে মাছের কলম্বু সম্পর্কে দর্জগত কাজ করে পোস্টার পেশারে উপর্যুক্ত কর।

এ বাড়োও মাছের ক্ষেত্রে জন্য উপকারী। বিভিন্ন জাতের হেটি মাছ যেমন- মলা, চেলা, কাটকি মাছে পুচুর ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। ভিটামিন 'এ' গ্রাহকান্ব গ্লোব দূর করে। মাছের কাঁটার পুচুর ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পাওয়া যায়, যা দেহের হাত গঠনে সাহায্য করে।

জীবিকার উৎস : বাংলাদেশে আর ১২ মিলিয়ন মানুষ মাছ থেকে বিভিন্নভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। বেমন-মাছ চাষ, মাছ ধরা, বিভিন্ন ইত্যাদি। অস্তসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশে কাজের সুযোগ কমে যাচ্ছে। মাছ চাষের মাধ্যমে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।



চিত্র : জেলোরা মাছ ধরছে



চিত্র : বাজারে বিক্রেতা মাছ বিক্রি করছে

বৈদেশিক মূদ্রা আর : মাছ বিদেশে বিক্রান্তি করে বাংলাদেশ পুচুর বৈদেশিক মূদ্রা আর করছে। যক্ষণ্য সম্পদ বর্তানি করে বে পরিমাণ বৈদেশিক মূদ্রা আর হয়, তার পতকরা আর ৮৬ জাগই আসে চির্যড়ি থেকে। মাছ চাষ বৃদ্ধি করে এ আর আরুণ বাড়ানো সম্ভব।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : বাংলাদেশে অনেক পতিত পুরুষ, জোবা ও নালা রয়েছে, যেখানে মাছ চাষ করা হয় না। এসব জলাশয়ে মাছ চাষ করে আমের পরিব ও বন্ধু আমের লোকেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

নতুন শব্দ : জলাশয়, আধিষ্ঠ।

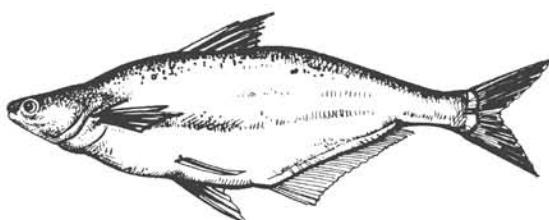
পাঠ- ১১ : পালাশ চাষের কলম্বু ও চাষের জন্য পুরুষ প্রযুক্তি

পালাশ মানুষের খুবই দিয়ে ও সুবাদু একটি মাছ। একসময় আমাদের নদীতে পর্যাপ্ত পালাশ পাওয়া বেত। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন কারণে অন্যান্য মাছের মতো নদীতে পালাশ মাছের প্রাপ্যতা কমে গেছে। বর্তমানে আমাদের দেশে খাইল্যান্ড থেকে আনা পালাশ মাছ চাষ করা হচ্ছে। বাজারে এ মাছের পুচুর চাইদা রয়েছে।

পালাশ মাছের বৈশিষ্ট্য : মাছের উপরের অংশ খুব এবং পেটের অংশ সাদা হয়। এদের গাঁরে কোলো আইশ থাকে না। মেহ চ্যাপটি, লবা আকৃতির, মাঝা ছেটি। পুরুষে চাষের জন্য খুবই উপরোক্তি। এ মাছে ছেট কাঁটা থাকে না। তাই খেতে খুব সুবিধা।

পাঞ্চাশ চাষের সুবিধা : যেকোনো ধরনের ছেট-বড় পুকুর, দিঘি, ডোবা ও বন্দ জলাশয়ে চাষ করা যায়। এ মাছ এককভাবে বা মিশ্রচাষও করা যায়। এ মাছ সর্বত্তুক বলে বিভিন্ন সম্পূরক খাবার সরবরাহ করে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়। হ্যাচারি থেকে সহজে এ মাছের পোনা পাওয়া যায়। এদের রোগ অতিরোধ ক্ষমতা ও বেঁচে থাকার হার বেশি। তাই চাষে ঝুঁকি কম। এ মাছ অল্প পানির মধ্যে রেখে জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায়।

কাজ : পাঞ্চাশ চাষের গুরুত্ব সম্পর্কে পোস্টার তৈরি কর এবং উপস্থাপন কর।



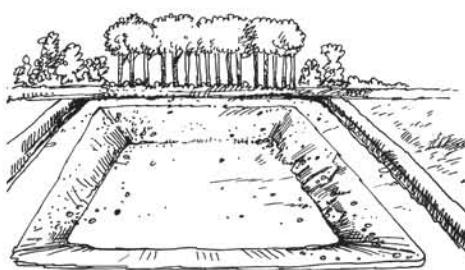
চিত্র : পাঞ্চাশ মাছ

চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতি : পুকুরে পোনা মাছ ছাড়ার আগে পুকুর প্রস্তুত করে নিতে হয়। পুকুর প্রস্তুতির জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করতে হবে-

- ১) পুকুরের পাঢ় মেরামত : প্রথমে পুকুরের পাঢ় মেরামত ও উঁচু করে বেঁধে দিতে হবে। পুকুর পাড়ে বোপ-বাঢ় থাকলে কেটে ফেলতে হবে। বড় গাছ থাকলে তার ডালগালা কেটে দিতে হবে।
- ২) পুকুর পরিকার : পুকুরে কোনো ধরনের জলজ আগাছা থাকবে না। পুকুরের তলায় বেশি কাদা মাটি থাকলে তা তুলে ফেলতে হবে। সম্ভব হলে কাদার স্তর শুরুয়ে পুকুরের তলা শক্ত করতে হবে। এতে ক্ষতিকর গ্যাস ও রোগজীবাণু দূর হয়।
- ৩) রাঙ্কুনে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ নির্ধন : পুকুরে রাঙ্কুনে মাছ ও অপ্রয়োজনীয় মাছ রাখা যাবে না। সেচের মাধ্যমে পুকুর শুরুয়ে বা ঘন ফাঁসের জাল বারবার টেনে এ কাজ করা যেতে পারে। পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে ৩০ সেমি পানির গভীরতার জন্য প্রতি শতকে ৩০ - ৩৫ গ্রাম মাছ মারার বিষ রোটেন পাউডার প্রয়োগ করে রাঙ্কুনে মাছ মেরে ফেলতে হবে। রোটেন দেওয়ার পর পুকুরের পানি ৭ - ১০ দিন ব্যবহার করা যাবে না। রোটেন ব্যবহারে মৃত মাছ খাওয়া যাবে।



চিত্র : জাল টেনে রাঙ্কুনে মাছ ধরা হচ্ছে



চিত্র : মাছ চাষের প্রস্তুতির জন্য শুকানো পুকুর

৪) চুন প্রয়োগ : উক্ত কাজগুলো শেষ হলে পুরুরের প্রতি শতকে ১ থেকে ২ কেজি করে চুন দিতে হবে। বালতি বা ড্রামে চুন নিয়ে গুলে সারা পুরুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। চুন পুরুরের পানি পরিষ্কার ও রোগজীবাণু দূর করে।

৫) পুরুরে সার প্রয়োগ : চুন দেওয়ার ৭ দিন পর পুরুরে শতক প্রতি ৫-৭ কেজি গোবর অথবা ২-৩ কেজি হাঁস মুরগির বিষ্ঠা, ১০০-১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০-১০০ গ্রাম টিএসপি সার পানিতে গুলে পুরুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের ৫-৬ দিন পর পুরুরের পানি সবুজ হলে বোঝা যাবে যে পুরুরে প্রাকৃতিক খাবার তৈরি হয়েছে। তখন মাছের পোনা ছাড়তে হবে।

নতুন শব্দ : মিশ্রচাষ, সম্পূরক খাদ্য, রাঙ্কুসে মাছ, রোটেনন।

পাঠ-১২ : পাঞ্জাশের পোনা ছাড়া, চাষকালীন মাছের পরিচর্যা ও মাছ আহরণ

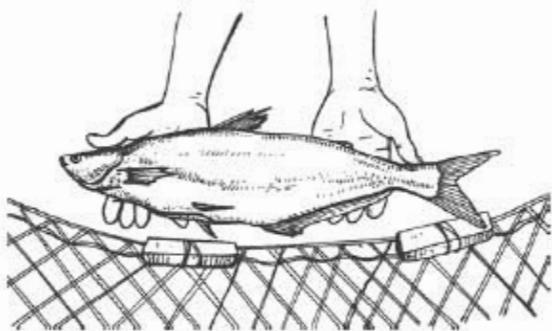
পোনা ছাড়া : পুরুরে পানির গভীরতা ১৫০-১৮০ সেমি হলে একক চাষের ক্ষেত্রে প্রতি শতকে ৭-১০ সেমি আকারের ১৩০-১৪০টি করে পাঞ্জাশ পোনা ছাড়তে হবে। মিশ্রচাষে শতকে ১২০-১২৫টি করে পোনার সাথে ৪-৫টি সিলভারকার্প বা কাতলার পোনা ছাড়া যেতে পারে। পুরুরে পোনা ছাড়ার পর মাছের যত্ন ও পরিচর্যা করতে হবে।

খাদ্য প্রয়োগ : পাঞ্জাশ একটি দ্রুত বর্ধনশীল মাছ। তাই পাঞ্জাশ চাষের পুরুরে নির্দিষ্ট সময় পর পর খাদ্য প্রদান করতে হবে। বাজার থেকে কেনা সুষম খাদ্য পুরুরে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু এতে উৎপাদন খরচ বেশি হয়। তাই বাজারজাত খাদ্য না কিনে এটি খামারেও বানানো যেতে পারে। নিচে পাঞ্জাশ মাছের জন্য ১০০ কেজি খাদ্য তৈরির উপকরণ দেওয়া হলো-

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণ	পরিমাণ (কেজি)
১	গুঁটকি মাছের গুঁড়া	২৫
২	খৈল	৩০
৩	গমের ভুসি	২০
৪	চালের কুঁড়া	২০
৫	আটা	৩.৫০
৬	লবণ	১
৭	ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ	০.৫০
	মোট =	১০০ কেজি

০ প্রতিদিন পুরুরে মোট মাছের ওজনের শতকরা ৪-৬ ভাগ হিসাবে খাবার দিতে হবে। প্রতিদিনের খাবার ২ ভাগে ৫ ভাগ করে সকাল ও বিকালে দিতে হবে। তবে পোনা মাছকে একটু বেশি ও বড় মাছকে কম খাবার দিতে হয়।

মাছের বৃদ্ধি ও বাস্তু পরীক্ষা : পুরুরে পোলা ছাড়ার পর মাছের বৃদ্ধি ও বাস্তুর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। একটি মাসে জাল টেনে মাছের বাস্তু ও বৃদ্ধি পরীক্ষা করতে হবে। গোপবালাই দমনে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের আগে পুরুরে পজকে প্রতি ২৫০ গ্রাম চূল ও ২৫০ গ্রাম লবণ সংগ্রহ একবার করে ৪-৬ সপ্তাহ দিতে হবে।



চিত্র : জাল টেনে মাছের বাস্তু পরীক্ষা



চিত্র : পুরুর থেকে মাছ আহরণ

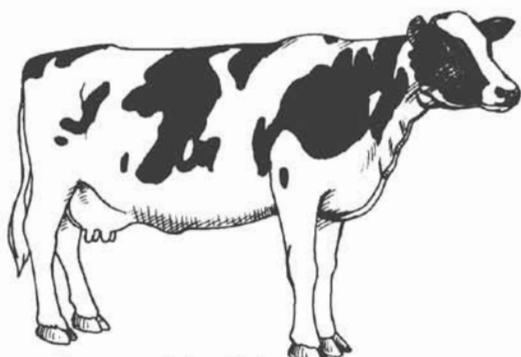
মাছ আহরণ ও বিক্রয় : পুরুরে পোলা ছাড়ার ৪ থেকে ৫ মাস পর মাছ গড়ে ৫০০ গ্রাম ওজনের হয়। তখন কিছু মাছ পুরুর থেকে উঠিয়ে বিক্রি করলে পুরুরে মাছের ঘনত্ব কমে যাবে। এতে পুরুরের অন্য মাছগুলো তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠবে।

কাজ : মাছের বাস্তু পরীক্ষার ক্রমীয়ির সম্পর্কে দেখ।

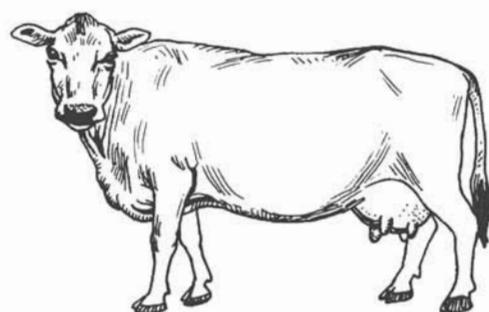
সম্মত শব্দ : অ্যাপ্রিল, ডিওমিন-খনিজ অ্যাপ্রিল

পাঠ- ১৩ : শৃঙ্খলালিত পজক পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য

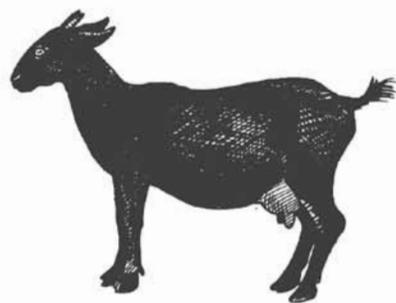
শৃঙ্খলালিত অনেক পজ বাস করে। এদের মধ্যে পজ, যবিষ, ছাগল, ডেড়া, ঘোড়া, উট ইত্যাদি পজকে শৃঙ্খলালিত পজের মানিয়ে লালন পালন করা যায় এবং এরা শৃঙ্খলালিত পজের মানিয়ে লালন করা যায়। এই এদেরকে শৃঙ্খলালিত পজ বলা হয়। এদের মতো কুকুর, বিড়ালও শৃঙ্খলালিত পজের পোষা হাশী। এরা সবাই আমাদের অনেক উপকারে আসে। বালোদেশে প্রায় ২৫ মিলিয়ন পজ ও ২৫ মিলিয়ন ছাগল আছে। আমাদের দেশি গাতি দৈনিক গড়ে ১ লিটার দূধ দেয়। কিন্তু বিদেশি উন্নত জাতের গাতি দৈনিক ১৫-২০ লিটার দূধ দেয়। উন্নত জাতের দূষ্ক উৎপাদনকারী পজের মধ্যে হলস্টাইল প্রিজিভান ও জার্সি অন্যতম।



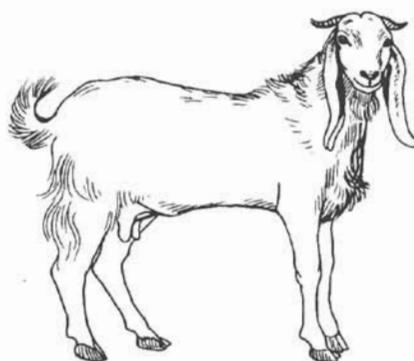
চিত্র : হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের গরু



চিত্র : জারি জাতের গরু



চিত্র : ব্র্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল

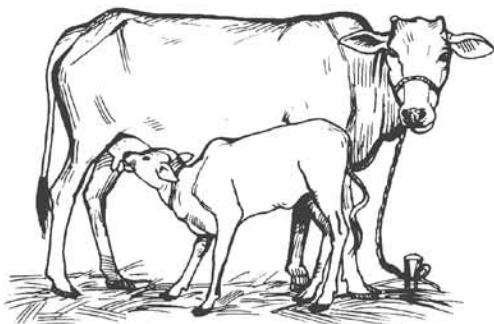


চিত্র : যমুনাপাড়ি বা রাম ছাগল জাতের ছাগল

শাহীওয়াল এবং রেড সিঙ্কি গাঙ্গি ও দৈনিক ৬-১০ লিটার দুধ দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের সর্বত্র কালো রঙের যে ছাগল পালন করা হয়, তাকে ব্র্যাক বেঙ্গল ছাগল বলা হয়। এটি মাঝে উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। তাছাড়া আমাদের দেশের মানুষ দুধের জন্য লম্বা পা ও ঝুলন্ত কানবিশিষ্ট যে ছাগল পালন করে, তাকে যমুনাপাড়ি বা রাম ছাগল বলা হয়।

গৃহপালিত পশু জন্মের দিন থেকে মানুষের আদর-যত্নে বড় হতে থাকে। এ কারণে গৃহপালিত আণী ও মানুষের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে। গৃহপালিত পশুর ভিন্ন ভিন্ন আচরণ বৈশিষ্ট্য থাকলেও এদের কভগ্নে সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হলো :

- ১। গৃহপালিত পশু সহজে পোষ মানে।
- ২। বাড়ির পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে।
- ৩। গৃহপালিত পশু তার পালনকারীদের সহজে চেনে।
- ৪। এরা মানুষের সামুদ্রিক পছন্দ করে।
- ৫। এরা বাড়ির মানুষের আচরণে সাড়া দেয়।
- ৬। গৃহপালিত পশু বাড়িতে বাচ্চা প্রসব করে।
- ৭। এরা স্বন্যপানী হয়ে থাকে।



চিত্র : স্তন্যপায়ী বাহুর



চিত্র : গরুর বিভক্ত খূব



চিত্র : ঘোড়ার অবিভক্ত খূব

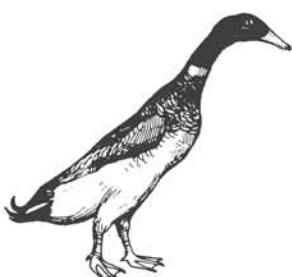
গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ডেড়া জাবরকাটা আণী। এদের খূব বিভক্ত ও যাথায় শিং
রয়েছে। এরা জমিতে চরে ধাস খায়। ঘোড়া জাবরকাটা আণী নয়। এদের শিং নেই ও খূব বিভক্ত নয়।
এরা দাঁড়িয়ে ঘূমায়। এরা দ্রুত দৌড়াতে পারে।

কাজ : গরু অথবা ছাগলের বৈশিষ্ট্য লিখ।

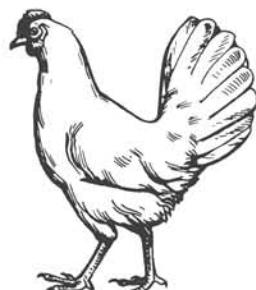
নতুন শব্দ : গৃহপালিত, জাবরকাটা।

পাঠ- ১৪ : গৃহপালিত পাখির পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য

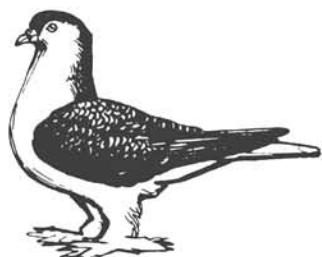
গৃহপালিত পশুর মতো হাঁস, মুরগি, কবুতর ইত্যাদিকে গৃহপালিত পাখি বলা হয়। কারণ, এদের পোষ
মানিয়ে গৃহে লালনপালন করা যায়। এরা গৃহে ডিম পাঢ়ে এবং ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটিয়ে থাকে। শিশু-
কিশোররাও বড়দের মতো কবুতর, হাঁস ও মুরগি পালনে খুব আগ্রহ দেখায়। গ্রামবাসীর মানুষ প্রায় ২৪৬
মিলিয়ন দেশি মোরগ-মুরগি ও ৪৬ মিলিয়ন হাঁস লালনপালন করছে। আমাদের দেশি মুরগি বছরে গড়ে ৪৫টি
এবং দেশি হাঁস ৭০টি ডিম পাঢ়ে। কিন্তু উন্নত জাতের লেগহৰ্ন, ফাওয়ামি, আর আই আর জাতের মুরগি বছরে
২০০-২৫০টি ডিম পাঢ়ে। বিদেশি জাতের ইন্ডিয়ান রানার, ধাকি ক্যামেল ও জেভিং হাঁস বছরে গড়ে ২৫০টি
ডিম উৎপাদন করে। পিকিন হাঁস মাংসের জন্য বিখ্যাত।



চিত্র : ধাকি ক্যামেল হাঁস



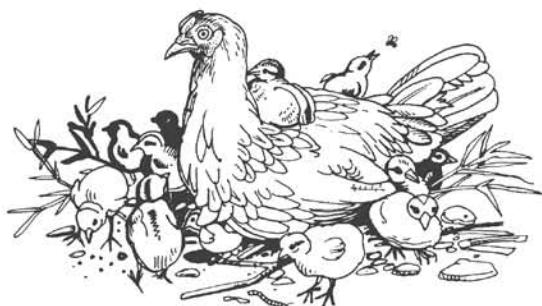
চিত্র : হোরাহো লেগহৰ্ন



চিত্র : লাহোরি কবুতর

গৃহপালিত পাখিরা বাড়িতে মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং তাদের জন্য তৈরি করা বিশেষ বাসস্থানে বসবাস করে। সকালে বাসা বা খাঁচা থেকে ছেড়ে দেবার পর এরা সারাদিন বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কবুতর খাদ্যের সঞ্চালনে অনেক দূর চলে যায় ও সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরে আসে। গৃহপালিত পাখির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

- ১। এরা সহজে পোষ মানে।
- ২। এরা বাড়ির পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেয়।
- ৩। এরা তার পালনকারীকে চেনে ও খাবারের জন্য পিছু নেয়।
- ৪। এরা গৃহে ডিম পাঢ়ে ও ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটায়।
- ৫। এরা বাচ্চা পালনে দক্ষ।
- ৬। এরা নিজের খাবার নিজে সংগ্রহ করতে পারে।



চিত্র : মুরগির বাচ্চা পালন



চিত্র : মুরগির খাবার গ্রহণ

এদের পায়ে ৪টি আঙুল থাকে। এদের মাথায় লাল ঝুঁটি ও গলায় লাল ফুল থাকে। মুরগি ৫ মাস বয়সে ডিম দেওয়া শুরু করে। মুরগি তার সন্তানকে বন্য পশু-পাখির হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে।

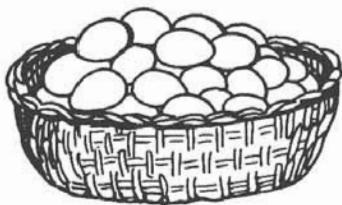
হাঁসকে জলজ পাখি বলা হয়। হাঁসের পায়ের আঙুল পর্দা দ্বারা মুক্ত। তাই এরা সহজে পানিতে সাঁতার কাটতে পারে। হাঁসের ডিমে তা দেবার অভ্যাস কর। তাই হাঁসের ডিম মুরগির নিচে রেখে ফুটানো হয়।

কাজ : মুরগি বা হাঁসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ কর।

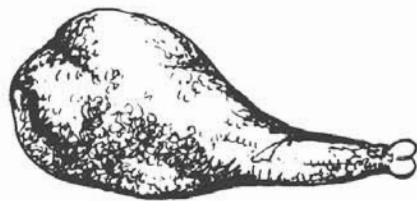
নতুন শব্দ : ঝুঁটি, জলজ পাখি।

পাঠ- ১৫ : গৃহপালিত পশু-পাখির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

গৃহপালিত পশু-পাখি সালনপালন করে আমরা আর্থিকভাবে সাহান হতে পারি। গৃহপালিত অধিকাংশ পশু-পাখির মাংস ও ডিম মানুষের নিকট খুব জনপ্রিয়। মানুষের শারীরিক বৃদ্ধি ও মেধা-মনন বিকাশের জন্য অন্যান্য খাবারের সাথে দৈনিক দুধ, ডিম ও মাংস খাওয়া আবশ্যিক। গরুর দুধ সুস্বাম খাদ্য। হাঁস-মুরগির ডিমও একটি পুষ্টিকর খাবার। এসব পুষ্টিকর খাবার আমাদের শরীরের আমিয়ের ঘাটতি পূরণ করে থাকে। তাই প্রতিদিনের খাবারে দুধ ও ডিম থাকা উচিত। মাংস, ডিম, দুধ, মিষ্টি, দই ইত্যাদি অতিথি আপ্যায়নে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র : হাঁস-মুরগির ডিম



চিত্র : গরুর মাংস

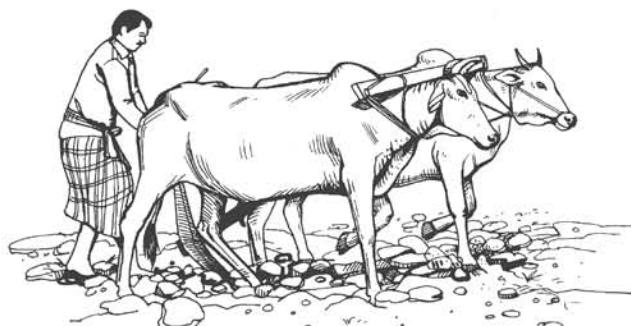
বাংলাদেশে দুধ, মাংস ও ডিমের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অনেক কম। বাজারে গৃহপালিত পশু-পাখি এবং এদের থেকে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা ও দাম দুটোই বেশি। তাই আমাদের গৃহপালিত পশু-পাখির পরিবারিক খামার করা দরকার। এতে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে। খামারের অতিরিক্ত উৎপাদিত ডিম ও দুধ বাজারে বিক্রি করে অর্থ আয় করা যাবে।



চিত্র : দুধ

গরু ও মহিষ জমি চাষ, পরিবহন, শস্য মাড়াই, ঘানিটানা এবং শস্য নিড়ানির কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গৃহপালিত পশু-পাখি আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। কৃষি-জমির আগাছা, ফসলের উপজাত, রান্না ঘরের বর্জ্য এদের খাবার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। হাঁস-মুরগি পোকামাকড় ও বারে পড়া দানা শস্য থেকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে। ভেড়ার পশম শীতবন্ধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

কৃকুর বিশ্বস্ত পোষা প্রাণী হওয়ায় পৃথিবীর সব দেশেই প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত হয়। দাঙা দমনে নিরাপত্তা বাহিনী ঘোড়া ব্যবহার করে। উট, ঘোড়া, গাধাসহ অনেক পশু ভার বহন কাজে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র : গরু দিয়ে জমি চাষ



চিত্র : পরিবহনে ঘোড়া



চিত্র : গরু দিয়ে শস্য মাড়াই

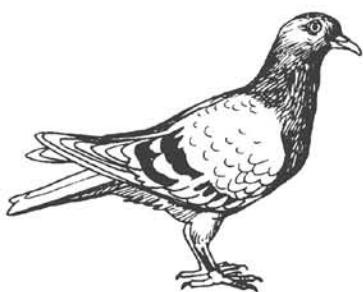
গরুর গোবর ও হাঁস-মূরগির বিষ্ঠা জৈবসার হিসাবে জমিতে ব্যবহার করা হয়। তাহাড়া এঙ্গলো মাছের খাদ্য তৈরিতে ও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

কাজ : গৃহপালিত গুণ অথবা পাখি আমাদের কী কী উপকারে আসে তা দলগত আলোচনার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

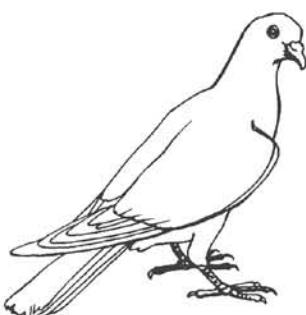
নতুন শব্দ : সুষম খাদ্য, পারিবারিক খামার, মানিটানা, উপজাত।

পাঠ-১৬ : করুতরের পরিচিতি ও পালন পদ্ধতি

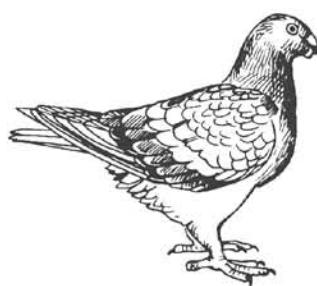
করুতর আমাদের অতিপরিচিত গৃহপালিত পাখি। বাংলাদেশের গ্রামে এমনকি শহর এলাকায়ও অনেককে করুতর পালন করতে দেখা যায়। আমরা সাধারণত গৃহপালিত পাখির ডিম ও মাংস উভয়ই খেয়ে থাকি। কিন্তু করুতরের ডিম খাওয়া হয় না, শুধু মাংস খাওয়া হয়। বিশেষ করে ৩-৪ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চা করুতরের মাংস খাওয়া হয়। করুতরের মাংস খুব নরম।



চিত্র : জালালি করুতর



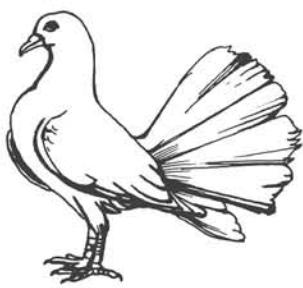
চিত্র : হোয়াইট কিং করুতর



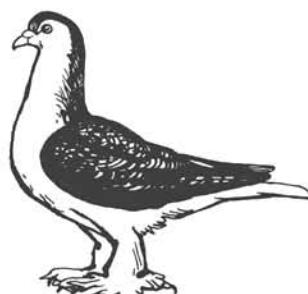
চিত্র : হোমার জাতের করুতর

পৃথিবীতে অনেক জাতের করুতর রয়েছে। মাঝে উৎপাদনের জন্য হোয়াইট কিং, সিলভার কিং, কারনাট ও হোমার বিশ্ববিখ্যাত। চিত্রবিনোদনের জন্য লাহোরি, ফ্যানটেইল, সিরাজি, গিরিবাজ, অয়ুরপত্তি ইত্যাদি জাতের করুতর রয়েছে। দেশি করুতরের মধ্যে জালালি, গোলা, গোলি, ডাউকা, লোটন, মুক্তি ইত্যাদি জাত দেখা যায়।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক করুতরের খামার তেমন দেখা যায় না। এ দেশে অনেকে চিত্রবিনোদন ও শখের বশে করুতর পালন করে থাকে। এতে চিত্রবিনোদনের পাশাপাশি করুতরের বাচ্চা তাদের পারিবারিক মাংসের চাহিদা পূরণ করে।



চিত্র : ফ্যানটেইল জাতের করুতর



চিত্র : লাহোরি জাতের করুতর



চিত্র : টামলা জাতের করুতর

একটি পুরুষ ও স্ত্রী করুতর জোড়ায় জোড়ায় বসবাস করে। করুতর ৫-৬ মাস বয়সে ২৮ দিন অন্তর ৪৮ ঘন্টার ব্যবধানে ২টি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার সময় হলে এরা উভয়ই খড়-কুটা টেনে বাসায় তোলে। ডিম পাড়ার পর উভয়ই পালাক্রমে ডিমে তা দেয়। করুতরের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটতে ১৮ দিন সময় লাগে।

করুতর পালন খুব আনন্দদায়ক। করুতরের মাঝে সুস্থাদু ও পুষ্টিকর। করুতর থেকে বছরে ৭-৮ জোড়া বাচ্চা পাওয়া যায়। করুতরের বাচ্চা ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যেই খাবার উপযোগী হয়। করুতর পালনে খরচ কম। যদ্ব পুর্ণজিতে করুতর পালন করা যায়। এদের রোগবালাই কম হয়।

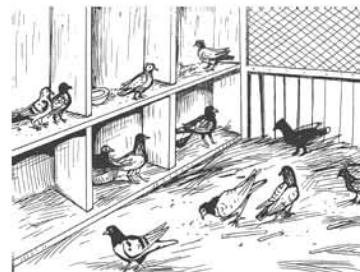
কাজ : বিভিন্ন জাতের করুতরের নামের ভালিকা তৈরি কর।

বহুকাল আগে থেকে মানুষ মুক্ত পদ্ধতিতে করুতর পালন করে আসছে। কিন্তু বর্তমানে অনেকে অর্ধ-আবক্ষ ও আবক্ষ পদ্ধতিতে করুতর পালন করছে। আমাদের দেশে সাধারণত মুক্ত অবস্থায় করুতর পালন করা হয়। আবার অনেককে তারের জাল দিয়ে থিবে অথবা বড় আবক্ষ ঘরে করুতর পালন করতে দেখা যায়।

মুক্ত পদ্ধতিতে পালন : সকালে করুতরকে বাসা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। দিনের বেলায় খাদ্যের খৌজে এরা বিভিন্ন জায়গায় উড়ে বেড়ায়। মাঝেমধ্যে বাড়ি এসে বিশ্রাম নিয়ে আবার চলে যায়। তবে সকাল আগেই এরা বাড়ি চলে আসে। এ অবস্থায় সাধারণত করুতরকে কোনো খাদ্য সরবরাহ করা হয় না। কিন্তু করুতর সবসময় মাঠ থেকে পরিমাণ মতো খাবার পায় না। তাই মুক্ত পদ্ধতিতে পালন করা করুতরকে বাড়িতে নিয়মিত কিছু খাবার সরবরাহ করলে ভালো বাচ্চা পাওয়া যায়।



চিত্র : মুক্ত পদ্ধতিতে করুতরের বাসা



চিত্র : আবক্ষ পদ্ধতিতে ঘরে করুতরের খোপ

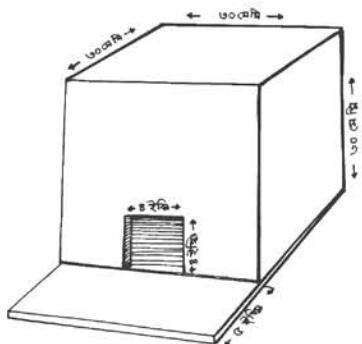
আবক্ষ পদ্ধতিতে পালন : আবক্ষ অবস্থায় বড় ঘরের মধ্যে করুতর পালন করা হয়। এ অবস্থায় করুতরের ঘরে যেন থারুর আলো-বাতাস চুক্তে পারে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এখানে ঘরের মধ্যে করুতরকে বাসা বা খোপ তৈরি করে দেওয়া হয়। তাছাড়া ঘরের মধ্যে করুতরের জন্য খাদ্য ও পানির পাত্রের ব্যবস্থা করতে হয়। বৃষ্টির পানি যাতে ঘরে না আসে, সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। ঘরের মধ্যে করুতর যাতে উড়তে পারে, সেদিকে লক্ষ রেখে বসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তবে যে পদ্ধতিই করুতর পালন করা হোক না কেন, খড়-কুটা টেনে বাসায় তোলা, ডিম পাড়া এবং ডিমে তা দেওয়ার সময় এদের বিরক্ত করা যাবে না।

অর্ধ-আবক্ষ পদ্ধতিতে পালন : অর্ধ-আবক্ষ অবস্থায় করুতর পালন করলে বহুতল বাসা তৈরিতে খরচ কম হয়। করুতরকে হিসাব করে অর্ধেক খাবার বাড়িতে সরবরাহ করতে হয়। অবশিষ্ট খাদ্য এরা মুক্ত অবস্থার মতো নিজেরা সংগ্রহ করে যায়।

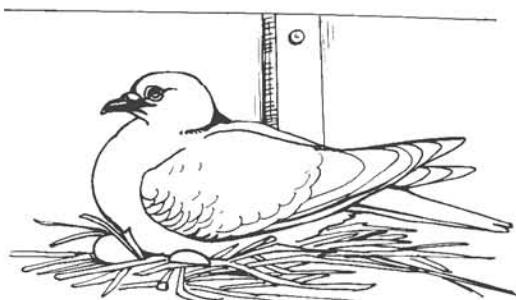
নতুন শব্দ : মুক্ত পদ্ধতি, আবক্ষ পদ্ধতি, অর্ধ-আবক্ষ পদ্ধতি, বহুতল, প্যাকিং কাঠ।

পাঠ-১৭ : করুতরের বাসস্থান ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

করুতরের বাসস্থান : করুতর একক বাসা বা খোপের মধ্যে বসবাস করতে পছন্দ করে। করুতরের বাসা মাটি থেকে উচ্চতে স্থাপন করতে হয়। বন্য পশু-পাখি যাতে এদের ক্ষতি করতে না পারে, সে দিকে লক্ষ রেখে বাসা তৈরি করতে হয়। কাঠ, পাতলা টিন, বাঁশ বা প্যাকিং কাঠ দিয়ে করুতরের বাসা বা খোপ তৈরি করা হয়। করুতর থেকে বেশি বাচ্চা পেতে হলে এক জোড়ার জন্য পাশাপাশি ২টি বাসা তৈরি করতে হবে। কারণ বাচ্চা পালনের সময় আবার ডিম পাড়ার সময় হলে সে বাচ্চার পাশের বাসায় নতুন করে ডিম দেয় এবং তা দিতে প্রয়োজন করে। করুতরের ঘর দুই বা ততোধিক তলা বিশিষ্টও হতে পারে। বহুতল বাসা তৈরিতে খরচ কম হয়।

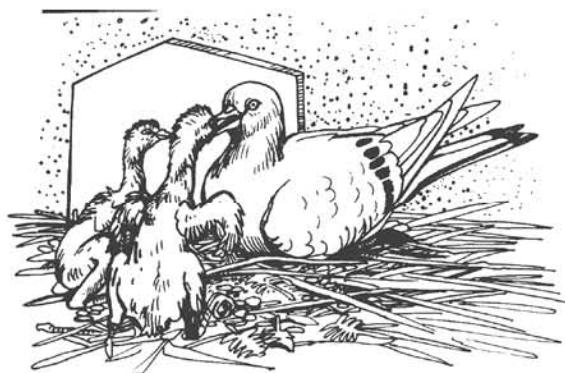


চিত্র : করুতরের একক খেপ



চিত্র : খোপে করুতর ডিমে তা দিচ্ছে

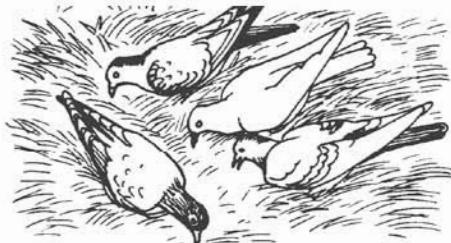
স্তৰী ও পুরুষ করুতর উভয়ই পালাত্রমে বাচ্চাকে খাওয়ায়। এরা বাচ্চার মুখের ভিতর ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে আদরের সাথে নিজ খাদ্যথলির রসমিশ্রিত নরম খাদ্য বাচ্চার মুখের ভিতর দেয়। এ রসমিশ্রিত নরম খাদ্য অত্যন্ত পুষ্টিকর হওয়ায় তা খেয়ে বাচ্চা দ্রুত বেড়ে উঠে। ২৮ দিন পর এদের পাখার পালক গজায় এবং এরা ঠোঁট দিয়ে তুলে খেতে পারে।



চিত্র : করুতর তার বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে

বয়ক করুতরের খাদ্য : করুতর ধান, গম, ভূট্টা, মটর, খেসারি, সরিষা, কলাই ইত্যাদি শস্যদানা খেতে পছন্দ করে। মুরগির অন্য তৈরি সুস্থ খাবারও করুতরকে খাওয়ানো যায়। প্রতিটি করুতর গড়ে দৈনিক ৫০ গ্রাম খাবার খেয়ে থাকে। করুতরকে বিনুকের খোসাচূর্ণ, চুনাপাথর, কাঠকয়লা চূর্ণ, লবণ ইত্যাদি একত্রে মিশিয়ে খেতে দিতে হয়। এতে তাদের খনিজ লবণের অভাব পূরণ হয়। করুতরের খাদ্য ও পানি পাত্রে সরবরাহ করতে হয়। মুক্ত ও অর্ধ-আবক্ষ পদ্ধতিতে করুতর নিজেই খাদ্যের সঙ্গানে বের হয়ে যায়। এরা বিভিন্ন ফসলের মাঠ হতে খাদ্য খেয়ে থাকে। ঘরে করুতরকে তৈরি খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

পানি সরবরাহ : কবুতরের পানি পান ও গোসল করার জন্য ঘরের মাঝখানে ২-৩টি গামলার বাবস্তা করতে হবে। গামলার ৩-৪ ভাগ পানি দিয়ে ভরে রাখতে হবে। এখান থেকেই এরা পানি পান ও গোসল করবে।



চিত্র : কবুতর মাঠে খাবার খাচ্ছে



চিত্র : কবুতর ঘরে দেওয়া খাবার খাচ্ছে

কবুতরের খাদ্য তালিকা-

কবুতরের খাদ্য উপাদান	শতকরা হার (%)
গম	৩০.০
ভূটা	২০.০
সরিষা দানা	১৫.০
খেসারি	২০.০
কলাই	১৪.৫
লবণ	০.৫
মোট	১০০

কাজ : কবুতরের বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের নাম লেখ এবং একটি খাদ্য তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : খাদ্যথলি, শস্যদানা, চুলাগাথর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ধান, মসুর, পাট, সরিষা, আখ হলো ফসল।
২. অঞ্চ জমিতে বেশি লাভ হলো ফসলের প্রধান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য।
৩. রোটেনন দেওয়ার পর পুকুরের পানি দিন ব্যবহার করা যাবে না।
৪. স্ত্রী ও পুরুষ কবুতর উভয়ই পালাত্রমে খাওয়ায়।

বাম পাশের সাথে ডা নপাশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. মরিচ	আমিষ।
২. পাট, তুলা	পশম।
৩. ডাল ফসল	মসলা।
৪. লালশাক	সুতা, কাপড়।
৫. তেঁড়ো	বন্ধুকালীন ফসল।

সংক্ষিঙ্গ উত্তর প্রশ্ন

১. কোন মাছকে রাক্ষুসে মাছ বলা হয়?
২. কোন গৃহপালিত পাথিকে জলজ পাথি বলা হয়?
৩. কবুতরের ডিম কত দিনে ফোটে?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. মাছ চামের জন্য পুকুরে কেন চুন প্রয়োগ করা প্রয়োজন তা লেখ।
২. গৃহপালিত পশুর ২টি অর্থনৈতিক শুরুত্ব লেখ।
৩. ‘স্বল্প পুঁজিতে কবুতর পালন করা যায়’- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি স্বাদু পানির মাছ?

ক. ছুরি	খ. শোল
গ. ইলিশ	ঘ. ভেটকি

২. পুরুরের তলার কাদার স্তর শুকালে-

- i. ক্ষতিকর গ্যাস দূর হয়
- ii. রোগজীবাণু দূর হয়
- iii. প্রাকৃতিক খাবার বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

৩. মাংসের জন্য বিধ্যাত কোন হাঁস?

- | | | | |
|----|----------------|----|---------------|
| ক. | পিকিন | খ. | ইভিয়ান রানার |
| গ. | খাকি ক্যাম্বেল | ঘ. | জেভিং |

৪. পশুর খাদ্য (Fodder Crops) হচ্ছে-

- i. গম, ভুট্টা
- ii. ফেলন, গিনি
- iii. ফেলন, নেপিয়ার

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

আলেয়া বেগম বাড়ির পাশেই তার ৫ শতক জমিতে মরিচের চাষাবাদ করলেন। গাছগুলো যথাযথ বৃদ্ধি পেল। ফসল সংগ্রহের সময় জাব পোকার আক্রমণ হওয়ায় তিনি তাঁক্ষণিক কীটনাশক স্প্রে করলেন।

৫. আলেয়া বেগমের জমিতে কী পরিমাণ গোবর সার লেগেছিল?

- | | | | |
|----|----------|----|----------|
| ক. | ১২০ কেজি | খ. | ১৬০ কেজি |
| গ. | ২০০ কেজি | ঘ. | ২৪০ কেজি |

৬. আলেয়া বেগমের তাঁক্ষণিক কীটনাশক স্প্রে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে?

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|-------------------------|
| ক. | সালোক সংশ্লেষণ বাধাগ্রস্ত হবে | খ. | ফসলের মান বৃদ্ধি পাবে |
| গ. | ফসল সংগ্রহ বিলম্ব হবে | ঘ. | প্রস্তেন বাধাগ্রস্ত হবে |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. রওশন আরা বসতবাড়ির সাথে খালি জায়গায় বিভিন্ন শাকসবজি চাষের সিদ্ধান্ত নিয়ে ৩ শতাংশের ১টি পুট টমেটো চাষের জন্য প্রস্তুত করেন। উন্নত জাত, সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ, যত্ন ও পরিচর্যার কারণে রওশন আরা টমেটোর সর্বোচ্চ ফলন পান। পারিবারিক প্রয়োজন মিটিয়ে তিনি কিছু টমেটো বাজারে বিক্রি করেন। রওশন আরার উদ্যোগটি দেখে আশেপাশের অনেকেই বসতবাড়িতে শাকসবজি বাগান করেন।

ক. উদ্যান ফসল কাকে বলে?

খ. লালশাকের বীজ বপন করতে বীজের সাথে বালি বা ছাই মেশানো হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. রওশন আরা টমেটো চাষের জন্য ৩ শতাংশ জমিতে কতটুকু গোবর সার প্রয়োগ করেছিলেন তা নির্ণয় কর।

ঘ. রওশন আরার উদ্যোগটি পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণে কী ধরনের ভূমিকা রাখবে? বিশ্লেষণ কর।

২. মনোয়ারা বেগম স্বামীর আয়ে সংসার চালাতে গিয়ে হিমশিম খান। তার বাড়িতে একটি পতিত জলাশয় ও কিছু খোলা উঁচু জায়গা আছে। তিনি প্রতিবেশীর পরামর্শক্রমে পতিত জলাশয়ে পাঙ্গাশ মাছ চাষ করার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে খোলা উঁচু জায়গাটিও তিনি চাষাবাদের আওতায় আনার পরিকল্পনা করলেন।

ক. চাষযোগ্য মাছ কাকে বলে?

খ. মাছ চাষের একটি অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

গ. মনোয়ারা বেগমের উক্ত মাছটি চাষের জন্য বাছাই করার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মনোয়ারা বেগমের পরবর্তী পরিকল্পনাটি কীভাবে তার সংসারে আয় বাঢ়াতে সহায়তা করবে? বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বনায়ন

লতা, শুল্প ও ছেটবড় গাছপালায় আচ্ছাদিত এলাকাকে বন বলা হয়। বনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো সেখানে উঁচু ও কাঞ্চল বৃক্ষ থাকবে। বনে নানারকম গন্ধ-পাখি ও পোকামাকড় বাস করে বনজ পরিবেশ তৈরি করে। বন আমাদের পরিবেশকে আবাস উপযোগী রাখে। কোনো দেশের সমগ্র এলাকার ২৫% প্রাকৃতিক বন থাকাটা আদর্শ অবস্থা। সরকারি হিসাব মতে, বাংলাদেশের ১৭% এলাকায় প্রাকৃতিক বন রয়েছে। বনকে রক্ষা করা ও নতুন বন সৃষ্টি করা এখন সময়ের দাবি। এ অধ্যায়ে প্রাকৃতিক বন, সামাজিক বন ও কৃষিবন সৃষ্টি এবং এর পরিচর্যা সম্পর্কে আমরা জানব। তাছাড়া বনের গুরুত্ব সম্পর্কেও আমরা তথ্য জানতে এবং উপলব্ধি করতে পারব।



চিত্র : সুন্দরবন



চিত্র : কৃষিবন

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- কৃষি ও সামাজিক বনের সাথে প্রাকৃতিক বনের তুলনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের মানচিত্রে প্রাকৃতিক বন চিহ্নিত করতে এবং ঐ সকল বনের উদ্দিদ ও প্রাণীর তালিকা তৈরি করতে পারব।
- কৃষি ও সামাজিক বনায়নের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়, কৃষি ও সামাজিক বনায়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বসতবাড়ির আঙিনায়, ছাদে, টবে, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- বসতবাড়ির আঙিনায়, ছাদে, টবে, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কৃষি ও সামাজিক বনায়নের অবদান তুলে ধরে পোস্টার অঙ্কন করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কৃষি ও সামাজিক বনায়নের অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

পাঠ-১ : প্রাকৃতিক বন, সামাজিক বন ও কৃষি বন

গাছপালায় ঢাকা বিস্তৃত এলাকাকে বন বলা হয়। বনে বড় বড় উদ্ভিদের সংখ্যা বেশি থাকে। এ ছাড়া মাঝারি গাছপালা ও লতা-গুল্মও বনে জন্মে থাকে। হরেক রকমের পশু-পাখি এবং কীটপতঙ্গ বনে বাস করে। এসব গাছপালা ও জীবজন্তু এক সাথে মিলেমিশে বনজ পরিবেশ সৃষ্টি করে।

বনের প্রকারভেদ

উৎপত্তি অনুসারে বন প্রধানত তিনি প্রকার, যথা- ক) প্রাকৃতিক বন খ) সামাজিক বন ও গ) কৃষি বন

প্রাকৃতিক বন

প্রাকৃতিকে আগনা-আপনি যে বিস্তৃত বনাঞ্চল সৃষ্টি হয়, তাকে প্রাকৃতিক বন বলে। শত শত বছর ধরে এ বনাঞ্চল গড়ে ওঠে। সুন্দরবন এরকম একটি প্রাকৃতিক বন। খুলনা শহরের দক্ষিণ অঞ্চলে এ বন অবস্থিত। বৃহস্পুর ঢাকার গাজীপুর ও মধুপুরের শালবনও প্রাকৃতিক বন। আমাদের দেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ঢাকা, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রাকৃতিক বন রয়েছে। এসব বনের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ হলো- সুন্দরি, শাল, গর্জন, গেওয়া, কেওড়া, বাইন প্রভৃতি। অঞ্চল ভেদে হাতি, বাঘ, হরিণ, বানর, ভালুক, অজগর এবং বিভিন্ন রকম পাখি ও পোকামাকড় এসব বনে বাস করে। এসব বন থেকে মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রাকৃতিক বন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিস্তৃতি অনুসারে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক বন তিনি প্রকার। এগুলো হলো- পাহাড়ি বন, সমভূমির বন ও উপকূলীয় বন।

- | | |
|--------------|--|
| কাজ : | <ol style="list-style-type: none"> ১. সুন্দরবনকে প্রাকৃতিক বন বলা হয় কেন? ২. শালবন কোথায় অবস্থিত? ৩. প্রাকৃতিক বনের ৫টি উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম লেখ। ৪. প্রাকৃতিক বন আমাদের কী উপকার করে? |
|--------------|--|

সামাজিক বন

বাড়িস্বর, মাদরাসা, পুকুরপাড়, রাস্তা ও বাঁধের দুই পাশে আমরা বিভিন্ন রকম গাছপালা রোপণ করে থাকি। এসব উদ্ভিদের বেশিরভাগই ফল জাতীয় হয়। আবার রেইনটি, মেহগনি, কড়ই জাতীয় বনজ গাছও লাগানো হয়। এসব গাছপালা আমাদের চারপাশে ছায়াঘন প্রশান্তিময় সবুজ পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ বন বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ থেকে আমাদের রক্ষা করে, আমাদের অর্থনৈতিকে সমৃদ্ধ করে। মানুষ নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিকল্পনা করে যে বন সৃষ্টি করে, তাকে সামাজিক বন বলে। পটুয়াখালী, নোয়াখালী, ভোলা এবং চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলে মানব তৈরি উপকূলীয় বন সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বনের প্রধান উদ্ভিদ কেওড়া ও বাইন। বিভিন্ন পার্ক, বৌটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদিও মানুষ বিনোদন ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করে গড়ে তোলে। এগুলোও সামাজিক বনের অন্তর্ভুক্ত।

কৃষি বন

আমাদের দেশের অনেক বাড়িতে এবং বাড়ির আঙিনায় বড় গাছপালার সাথে সবজি চাষ করা হয়। ফলের বাগানে ও ফসলি জমির আইল, ক্ষেত-খামারে পৌছার পথ, পুকুরের চারপাশ, খাল-সেচনালার পাশে ছেট-বড় গাছ লাগানো যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে মাঠ ও উদ্যান ফসলের ক্ষতি করবে না এমন গাছ নির্বাচন করা হয়। এভাবে তৈরি বনকে কৃষি বন বলে।

অর্থাৎ একই জমিতে বহুমুখী ফসল, বৃক্ষ, মাছ ও পশু-পাখির খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে কৃষিবন বলা হয়। কৃষি বনে মাঠ ফসল, তাল, সুপারি, নারিকেল, কলা, আম, কাঁঠাল, ইপিল-ইপিল প্রভৃতি গাছ লাগানো হয়। কৃষি বন অধিক খাদ্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ করে।

কাজ : দলগতভাবে আলোচনা করে নিচের ছকটি পূরণ কর:

	প্রাকৃতিক বন	সামাজিক বন	কৃষি বন
কেমন করে সৃষ্টি হয়			
উদ্ভিদের নাম			
প্রাণীর নাম			
উপকারিতা			

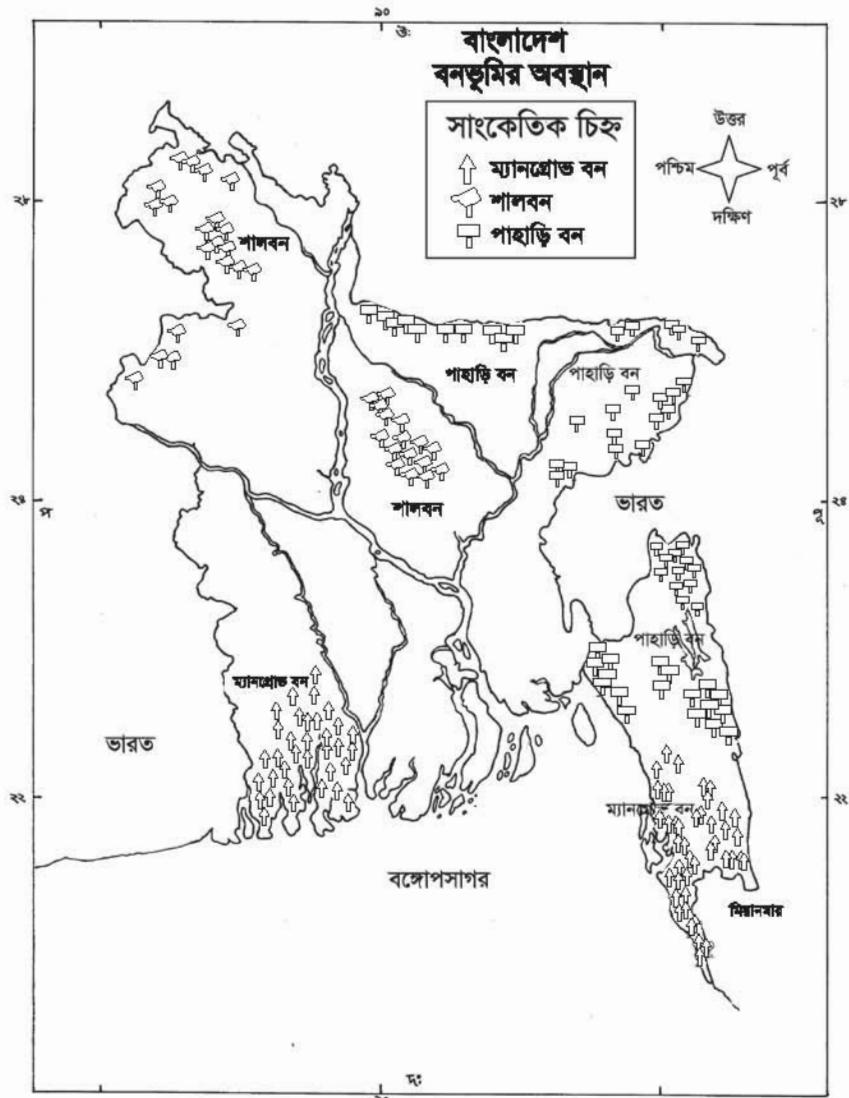
নতুন শব্দ : প্রাকৃতিক বন, সামাজিক বন, কৃষি বন, আত্মকর্মসংস্থান, পরিবেশ সংরক্ষণ।

পাঠ- ২ : বিভিন্ন প্রাকৃতিক বনের ধারণা ও গুরুত্ব

প্রাকৃতিক বন

মানচিত্রে বাংলাদেশের বনভূমির অবস্থান ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর। বন্ধুর সাথে পর্যবেক্ষণ করে পাহাড়ি বন, গাজীপুর ও মধুপুরের শালবন এবং উগ্রকূলীয় সুন্দরবন শনাক্ত কর। এসব বনকে কেন প্রাকৃতিক বন বলা হয় আলোচনা কর। বাস্তবে বা টেলিভিশনে এসব বন দেখে ধাক্কে সে সম্পর্কে বলো।

অবস্থান ও বিস্তৃতি অনুসারে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক বন প্রধানত ৩ প্রকার, যথা- পাহাড়ি বন, সমতল ভূমির বন ও উগ্রকূলীয় বন।



চিত্র : মানচিত্রে বাংলাদেশের বনভূমির অবস্থান

পাহাড়ি বন

বাংলাদেশের মধ্যে পাহাড়ি বনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশি। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে এ বন অবস্থিত। সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার প্রাকৃতিক বন পাহাড়ি বন বলে পরিচিত।

এসব পাহাড়ি বনে গর্জন, চাপালিশ, তেলসুর, শিলকড়ই, গামার প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। এসব মূল্যবান বৃক্ষ থেকে উন্নতমানের কাঠ পাওয়া যায়। পাহাড়ি বনে বহু রকমের বাঁশও জন্মায়। এই বনে হাতি, বানর, শূকর, ভালুক, বনমুরগি, হনুমান, অজগর, প্রভৃতি বন্য প্রাণী বাস করে। বিচ্ছিন্ন ধরনের পাথি ও কীটপতঙ্গও এখানে রয়েছে।

সমতল ভূমির বন

বৃহত্তর ঢাকা, যয়মনসিংহ, দিনাজপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লার সমতল এলাকায় যে প্রাকৃতিক বন রয়েছে, তা সমতল ভূমির বন হিসেবে পরিচিত। প্রধান বৃক্ষ শাল। তাই এ বনকে শালবন বলা হয়। শাল বৃক্ষ গজারি নামে পরিচিত।

এ বনে গজাবি, ছাড়াও কড়ই, রেইনট্রি, জাকুল প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। নেকড়ে, বানর, সাপ, ঘুঁঁটু, দোয়েল, শালিক প্রভৃতি জীবজন্তু এ বনে বাস করে। মানবস্ট কারণে সমতল ভূমির প্রাকৃতিক বন দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। বনকে ধর্বসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এলাকার জনগণের সত্ত্বিয় অংশগ্রহণ দরকার। সে কারণে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

উপকূলীয় বন

সমুদ্র উপকূলে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠা বনকে উপকূলীয় বন বলা হয়। এ ছাড়া পরিকল্পিত উপায়ে সমুদ্র উপকূলে সামাজিক বন গড়ে তোলা হলেও তাকে উপকূলীয় বন বলে। কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ভোলা, খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরায় উপকূলীয় বন অবস্থিত। খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পটুয়াখালীর উপকূলীয় বন সুন্দরবন নামে পরিচিত। প্রতিনিয়ত সমুদ্রের জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় বলে একে ম্যানগ্রোভ বনও বলা হয়। সুন্দরবন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন। এ বনের মোট আয়তন ৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার। এ বন পৃথিবীর বৃহত্তম উপকূলীয় প্রাকৃতিক বন। এ বনের নেসর্গিক সৌন্দর্য অপরূপ।

এ বনের প্রধান বৃক্ষ সুন্দরি। এ ছাড়া পশুর, গোওয়া, গরান, কেওড়া, গোলপাতা প্রভৃতি এ বনের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ। এ বনের প্রধান আকর্ষণ রয়েল বেঙ্গল টাইগার। চিঁা হরিণ, চিতাবাঘ, বন্য শূকর, বানর, কুমির, ঘড়িয়াল, অজগর এবং নানা প্রজাতির পাথি, কীটপতঙ্গ এ বনে বাস করে। এ বনের বৃক্ষ থেকে প্রাণ কাঠ গৃহনির্মাণ, নিউজপ্রিন্ট তৈরি ও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রতিবছর এ বন থেকে প্রচুর পরিমাণ মধু ও মোম সংগ্রহ করা হয়।

কাজ : নিচের অসম্পূর্ণ চিত্রটি দিয়ে দলীয়ভাবে পোস্টার তৈরি কর ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর



পাঠ-৩ : সামাজিক বন ও বনায়ন

চিরের বনের দৃশ্য পর্যবেক্ষণ কর। সামাজিক বনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বলো। মাদরাসার চারদিকের বাগানকে কী বলে? মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিকল্পনা করে যে বন তৈরি করে, তাই সামাজিক বনায়ন। সড়ক ও বাঁধ বন এবং উপকূলীয় মানবসৃষ্ট কেওড়া বন, সামাজিক বনায়নের উদাহরণ। রেইন্ট্রি, কড়ই, আকাশমণি, মেহগনি সড়ক ও বাঁধের দুই পাশে লাগানো হয়।

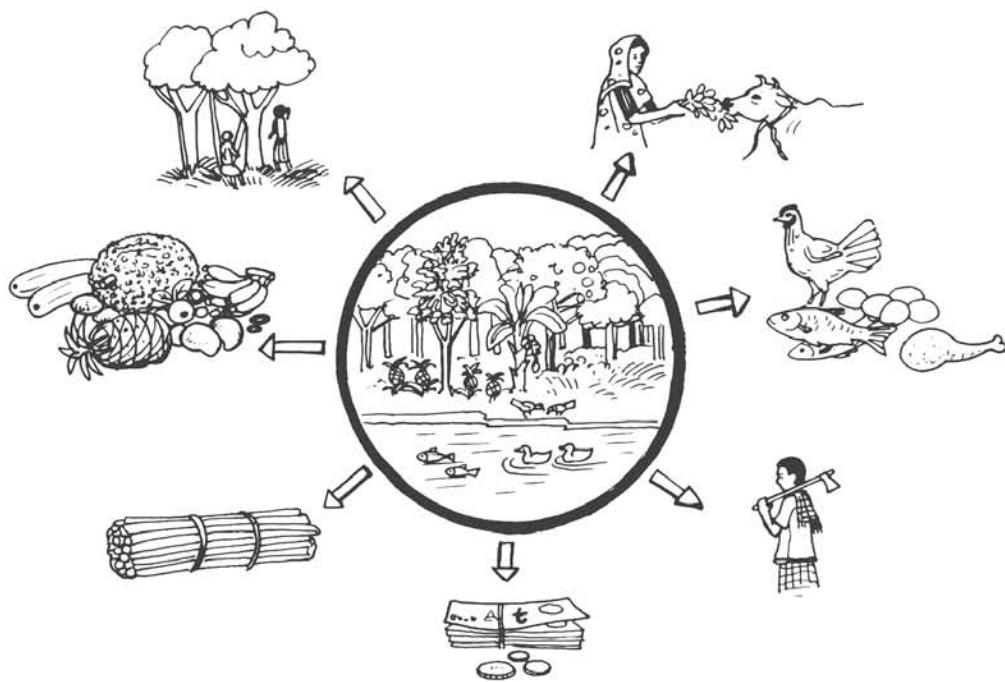


চিত্র : সড়ক ও বাঁধের ধারে বন (সামাজিক বন)

কাজ : নিচের ছকটি দলীয় আলোচনার মাধ্যমে পূরণ কর

বিভিন্ন প্রকার সামাজিক বনের নাম	কী কী উত্তিদ পাওয়া যায়	কী উপকার করে
বসতবাড়ির বন		
মাদরাসার বন		
সড়ক ও বাঁধ বন		
উপকূলীয় মানবসৃষ্ট বন		

সারা দেশের বনজ সম্পদের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে এবং পরিবেশ রক্ষায় গ্রামীণ জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে সামাজিক বনায়ন করা হয়।



চিত্র : সামাজিক বনের গুরুত্ব

কাজ : উপরের চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে দলগতভাবে সামাজিক বনের গুরুত্বের তালিকা তৈরি কর।

এবার আমরা সামাজিক বনের যেসব গুরুত্বের কথা বলেছি, তার সাথে নিচের বিষয়গুলো মিলিয়ে নেই।

সামাজিক বনের গুরুত্ব

- ছায়াছেরা সুশীতল ঘনোরম পরিবেশ তৈরি হয়।
- গ্রামের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দেয়।
- কাঠ, জ্বালানি ও শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করে।
- গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- পতিত জমির সঠিক ব্যবহার হয়।
- দারিদ্র্য বিমোচনসহ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।

ପାଠ-୪ : କୃଷି ବନ ଓ ବନାଯନ

କୃଷି ବନେର ଚିତ୍ରାଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର । ଦଲୀଲ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଚିତ୍ରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଲୋ ଲେଖ ।

ଏ ବ୍ୟକ୍ତମ ଏକଇ ଜୟିତେ ଏକଇ ସମୟେ ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣମେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଛ, ଫୁଲ ଓ ପଣ୍ଡଗାଢି ଉତ୍ସାହିତ ହଜେ କୃଷି ବନାଯନ । କୃଷି ବନ ଉପଧୋଗୀ ଉତ୍ସିଦେର ସଂଖ୍ୟା ଅସଂଖ୍ୟ । କୃଷି ବନେ ସୁପାରି, ତାଳ, ରୈଜୁର, ବାବଲା, ନାରକେଳ, ମେହଗନି, ଇତ୍ୟାଦି ଫୁଲ ଓ କାଠେର ଗାଛ ଫୁଲାଣି ଜୟିର ଆଇଲ ବା ଝାଁକେ ଝାଁକେ ରୋପଣ କରା ହେଁ ।



ଚିତ୍ର : ଫୁଲ ଗାଛ ଓ ମାଠ ଫୁଲ (କୃଷି ବନ)

କୃଷି ବନାଯନ ପଦ୍ଧତି

ଆମାଦେର ଦେଶେ ଜଳସଂଖ୍ୟାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଧିକ । ସେ ତୁଳନାୟ କୃଷି ଜୟିର ପରିମାଣ ଖୁବଇ କମ । ସେ କାରଣେ ଏହି ଜୟିତେ ବହୁମୁଖୀ ଫୁଲ ଫୁଲାଣୀ ଏଥିର ସମୟେର ଦାବି । ଭୂମିର ପ୍ରକୃତି ଓ ଜୀବନୀୟ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତମ କୃଷି ବନାଯନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରା ଯେତେ ପାରେ । ସେମନ-

୧. ବୃକ୍ଷ ଓ ମାଠ ଫୁଲ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି

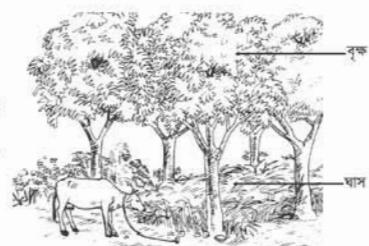
କୃଷି ବନାଯନେର ଏ ପଦ୍ଧତିତେ ଏକଇ ଜୟିତେ ମାଠ ଫୁଲରେ ସାଥେ ବୃକ୍ଷର ସମସ୍ତିତ ଚାଷ କରା ହେଁ । ଏର ଫୁଲେ ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ବୈଶି ହେଁ ।



ଚିତ୍ର : ବୃକ୍ଷ ଓ ମାଠ ଫୁଲ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି

୨. ବୃକ୍ଷ ଓ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି

ଏ ପଦ୍ଧତିତେ ଏକଇ ଜୟିତେ ବୃକ୍ଷ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସିଦେର ସାଥେ ପଣ୍ଡାଦ୍ୟର ଚାଷ କରା ହେଁ । ଏତେ ଏକଦିକେ ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ, ଅନ୍ୟଦିକେ ଫୁଲ ଉତ୍ସାହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ । ମାଟିର କ୍ଷୟ ରୋଧ ହେଁ ।



ଚିତ୍ର : ବୃକ୍ଷ ଓ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି

୩. ବନଜ ଓ ଫୁଲଦ ଉତ୍ସିଦ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି

ଏ ଧରନେର କୃଷି ବନାଯନେ ବନଜ ବୃକ୍ଷର ସାଥେ ଫୁଲଦ ବୃକ୍ଷର ଚାଷ କରା ହେଁ । ଏ ପଦ୍ଧତି ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ । ଏ ପଦ୍ଧତିତେ ଜୟିର ବହୁମୁଖୀ ଉତ୍ସାହିତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଁ । ତାହାଙ୍କୁ ଜୟିର ଉର୍ବରତାଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ । ପଣ୍ଡ-ଗାଢି ଓ କାଟଗତଜେତର ଆବାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଁ, ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଁ । ଉଦାହରଣ: ଇପିଲ-ଇପିଲ, ନାରିକେଳ, ଲିଚୁ ଗାହେର ସାଥେ ଆନାରସ ।



কাজ : দলগত আলোচনার মাধ্যমে নিচের চিত্রটি সম্পর্ক কর।



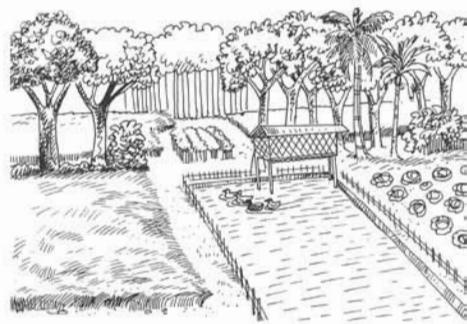
নতুন শব্দ : কৃষি বনায়ন, সমর্পিত চাষ।

পাঠ-৫ : কৃষি ও সামাজিক বনায়নের পার্থক্য

কৃষিজ ফসল ও বনজ বৃক্ষ একসাথে চাষ করার পদ্ধতিই হলো কৃষি বনায়ন। এ বনায়নের মাধ্যমে কৃষক ভূমির সঠিক ব্যবহার করতে পারে। ফলে উৎপাদন বেশি হয়। কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। সামাজিক বনায়নে গ্রামীণ জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করে। বাড়ির আঙিনা, প্রতিষ্ঠান, সড়ক ও বাঁধ, নদী ও খাল পাড় প্রভৃতি জায়গায় বনায়ন করা হয়। জনগণের কল্যাণে জনগণ সৃষ্টি এ বনায়ন সামাজিক বনায়ন নামে পরিচিত।



১ নং চিত্র

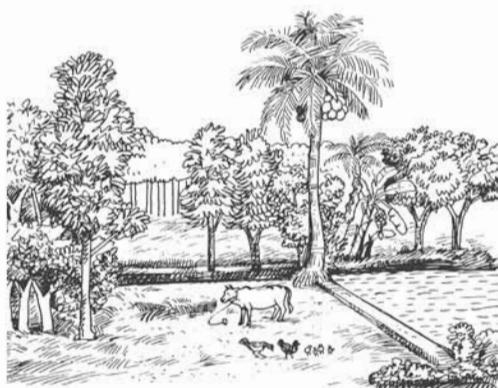


২ নং চিত্র

কাজ

- ক) ১ ও ২নং চিত্র দুটি পর্যবেক্ষণ কর। কোনটি কিসের চিত্র তা লেখ?
- খ) কোন ধরনের বনায়নে ভূমির ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হয়?
- গ) কোন বনায়নের মাধ্যমে একই জমিতে বারবার বহুবৃক্ষ ফসল ফলে?
- ঘ) কোন বনায়নে জনগণ সরাসরি অংশ নেয়?
- ঙ) প্রতিঠান, বাঁধ, সড়ক ও রেল সড়কের বনায়নকে কী বলে?
- চ) কৃষি বনায়নের কয়েকটি উদ্দিদ ও প্রাণীর নাম লেখ।
- ছ) সামাজিক বনায়নের ২টি উদ্দিদ ও প্রাণীর নাম লেখ।
- জ) উপকূলীয় অঞ্চল ও পাহাড়ি পতিত জমিতে কী ধরনের বনায়ন হয়?

কৃষি বনায়ন ও সামাজিক বনায়নের পারস্পরিক সম্পর্ক



চিত্র: কৃষি বনায়ন



চিত্র: সামাজিক বনায়ন

১. কৃষি বনায়নের মাধ্যমে একই সাথে ফসল, বৃক্ষ, মাছ ও পশু-পাখির খাদ্য উৎপাদন করা যায়। তবে একই সাথে বৃক্ষ ও ফসল উৎপাদনকে কৃষি বনায়ন বলা হয়। কিন্তু সামাজিক বনায়নের ফলে কেবল কাঠ ও ফল উৎপাদনকারী উদ্দিদ উৎপাদন করা যায়।

২. সামাজিক বনায়নের ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণিবান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়। গ্রামীণ জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক বনায়ন করে থাকে। জনসাধারণের চেষ্টায় সৃষ্টি হয় সামাজিক বন। কৃষি বনায়নে কাঠ ও ফল উৎপাদনকারী উদ্ভিদের পাশাপাশি মাঠ ফসল চাষ করা যায়।
৩. কৃষি বনায়নে একই জমি বারবার ব্যবহার করে পর্যায়ক্রমে শস্য উৎপাদন করা হয়। এর ফলে বেশি ফসল পাওয়া যায়। জমির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়। সামাজিক বনায়নে একই জমি একাধিকবার ব্যবহারের সুযোগ কম।
৪. কৃষি বনায়নের মাধ্যমে কৃষি খামার, মৎস্য খামার, মৌমাছি চাষ, রেশম চাষ করা যায়। ফলে খাদ্য, বস্ত্রসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ বাঢ়ে। অপর দিকে সামাজিক বনায়নের ফলে মূল্যবান কাঠ ও নানা রকম ফল পাওয়া যায়।
৫. সড়ক, রাজপথ, বাঁধ ও রেলপথে সামাজিক বনায়ন করা হয়। বিভিন্ন, প্রতিষ্ঠান ও হাট-বাজারেও সামাজিক বনায়ন করা হয়। ফসলি মাঠ, বাড়ির আঙিনা, পাহাড়ি পতিত জমি এবং উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি বনায়ন করা হয়। আজকাল বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক বনেও সামাজিক বনায়ন ও কৃষি বনায়ন করা হচ্ছে। যেমন : মধুপুর ও ভাওয়ালের শালবন।

কাজ : কৃষি বনায়ন ও সামাজিক বনায়ন নিয়ে দলীয় আলোচনা করে নিচের ছকটি পূরণ কর।		
পার্থক্যের বিষয়ে প্রশ্ন	কৃষি বনায়ন	সামাজিক বনায়ন
১. এ ধরনের বনায়ন কোথায় করা হয় ?		
২. মিটি উৎপাদিত উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম লেখ।		
৩. কাদের অংশগ্রহণের ফলে সৃষ্টি হয় ?		
৪. জমির ব্যবহার কীভাবে করা হয় ?		
৫. সুবিধা কী কী ?		
৬. তুমি কীভাবে অংশগ্রহণ করতে পার ?		

নতুন শব্দ : উদ্ভিদ ও প্রাণিবান্ধব পরিবেশ, কৃষি খামার।

পাঠ - ৬ : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনের ভূমিকা

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এসব বনের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ ভূমিতে বন থাকা অপরিহার্য। আমাদের দেশে বর্তমানে বনের পরিমাণ মোট আয়তনের ১৭ ভাগ। সুতরাং দেশের বনজ সম্পদ বাড়ানোর জন্য কৃষি বন এবং সামাজিক বনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এবার দেখা যাক এসব বন কীভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখে।

১. বনের গাছপালা বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং অক্সিজেন পরিবেশে ছেড়ে দেয়। ফলে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকে।
২. এসব বনের গাছপালা বাতাসে জলীয়বাস্প সরবরাহ করে। ফলে পরিবেশ ঠান্ডা থাকে। এ জলীয় বাস্প মেঘ ও বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহায্য করে।
৩. আবহাওয়ার চরমভাবাপন্নতাহাস করে। বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করে।
৪. এসব বন মাটিকে উর্বর করে নতুন উদ্ধিদ সৃষ্টির উপযোগী পরিবেশ রক্ষা করে।
৫. জীবজগতের খাদ্য উৎপাদন করে এবং আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করে।
৬. ভূমিক্ষয় ও ভূমিধস থেকে পরিবেশ রক্ষা করে।
৭. টর্নেডো, ঝড় জলোচ্ছাস ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে জনপদ রক্ষা করে।
৮. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়তা করে।

কাজ : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কৃষি ও সামাজিক বনের অবদান সম্পর্কীয় মানচিত্র তৈরি কর।



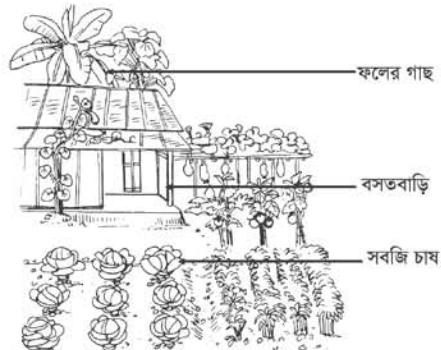
নতুন শব্দ : পরিবেশের ভারসাম্য, চরমভাবাপন্ন, জীববৈচিত্র্য।

পাঠ-৭ : বসতবাড়ির আঙিনায় বৃক্ষরোপণের নিয়মাবলি

বসতবাড়ির চারপাশে নানারকম গাছপালা সাগানো হয়। বাড়ির আঙিনায় বিভিন্নরকম সবজি চাষও করা হয়। এর ফলে বাড়িতে ছায়াধৰে মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ রকম পরিবেশে দেহ ও মন সুস্থ থাকে। বাগানের বিভিন্ন রকম ফল ও সবজি বাড়ির লোকজনের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে। অতিরিক্ত উৎপাদিত দ্রব্যাদি পরিবারের অর্ধলিতিক সমৃদ্ধি এনে দেয়।



চিত্র : বসতবাড়ির গাছপালা



চিত্র : বসতবাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ

বসতবাড়িতে প্রধানত ফল জাতীয় গাছ যেমন : আম, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি, পেয়ারা, কুল প্রভৃতি গাছ সাগানো হয়। অনেক বাড়িতে নানা রকম কাঠের গাছ যেমন : সেগুন, মেহগনি ইত্যাদি গাছ সাগাতে দেখা যায়। এ ছাড়া বসতবাড়ির আঙিনায় লাউ, শসা, শিম, পুইশাক, বেগুন, টমেটো, মরিচ জাতীয় সবজি চাষও করা হয়।

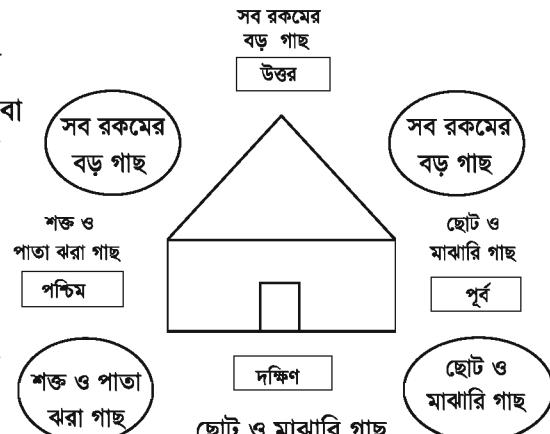
কাজ : তোমাদের বসতবাড়ির আঙিনায় যেসব গাছপালা আছে তাৱ তালিকা দলগত ভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

বসতবাড়িতে গাছ সাগানোর সময় যেসকল বিষয় লক্ষ রাখতে হবে, তা হলো :

১. বসতবাড়ি হতে দূরে গাছপালা সাগাতে হবে। যাতে গাছের মরা ডাল ও পাতা বারে বসতবাড়ির টিনের চালা ও ছাদের ক্ষতি করতে না পারে।
২. বাড়িতে আলো-বাতাস প্রবেশে যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
৩. ঝড় তুফানে গাছপালা ভেঙে পড়ে যেন জীবনহানি বা বাসগৃহের ক্ষতি করতে না পারে।
৪. গাছপালা যেন বসতবাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে মনোরম পরিবেশ তৈরি করে।

বসতবাড়ির বৃক্ষরোপণের বিভিন্ন নিয়মাবলি

- পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে ছোট ও মাঝারি আকারের গাছ যেমন- পেয়ারা, আতা, শরিফা, মেহেদী, জবা ইত্যাদি গাছ লাগাতে হবে। কারণ দক্ষিণ ও পূর্ব দিক দিয়ে বাড়িতে যাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে।



চিত্র: বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপণের নকশা

- দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম দিকে শক্ত ও পাতাবরা গাছ লাগানো উচিত। যেমন: সুপারি, নারিকেল, শিশু, সেগুন ইত্যাদি। এসব গাছের ডালপালা কম ও শীতকালে পাতা বরে যায়। ফলে বাড়িতে পর্যাপ্ত রোদ আসতে পারে।
- বাড়ির উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে সব রকমের বড় গাছপালা লাগানো যায়। যেমন: আম, কাঁঠাল, জাম, মেহগনি, কড়ই ইত্যাদি। এসব বড় বড় বৃক্ষ কালবৈশাখীর হাত থেকে আমাদের বাড়িঘরকে রক্ষা করে।
- বাড়ির উত্তর-পশ্চিম দিকে ফাঁকা জায়গা বেশি থাকলে বাঁশ লাগানো যেতে পারে। কারণ গ্রামীণ জীবনে বাঁশের ব্যবহার বেশি হয়। তাছাড়া বাঁশের অর্থনৈতিক গুরুত্বও বেশি।
- এছাড়াও বাড়ির পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে বিভিন্ন শাকসবজি চাষ করা যায়। ধুন্দল, মেটে আলু, শিম, বিঙ্গা, গোলমরিচ ইত্যাদি লতানো উদ্ভিদগুলো মাঝারি উচ্চতার গাছে জমানো যায়। তাছাড়া বাড়ির ছায়াযুক্ত স্থানে আদা, হলুদ, মানকচু ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে।

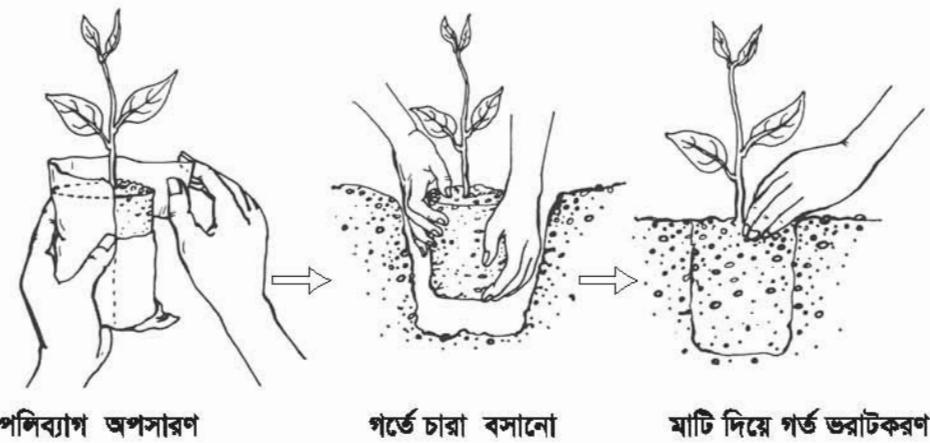
কাজ: বসতবাড়িতে গাছপালা লাগানোর সময় কী নিয়ম মানতে হয় তা আলোচনা করে লিখ।

নতুন শব্দ: পাতাবরা বৃক্ষ, কালবৈশাখী বড়।

পাঠ-৮ : বসতবাড়ির আঙিনায় বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্চা

সব জাহাজায় বৃক্ষরোপণের নিয়ম থায় একই রকম। বসতবাড়ির আঙিনায় বৃক্ষরোপণের জন্য মৌসুমি বৃষ্টি শরু হওয়ার এক মাস আগে গর্ত করতে হবে। গর্তের আকার হবে ($50\text{সেমি} \times 50\text{ সেমি} \times 50\text{ সেমি}$)। গর্তে মাটির সঙ্গে ১০ কেজি গোবর সার, ৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ৫০ গ্রাম এমওপি সার ভালো করে মেশাতে হবে। সার মেশানো মাটি গর্তে কমপক্ষে এক মাস রেখে দিতে হবে। এক মাস পর যখন মৌসুমি বৃষ্টি শরু হবে, তখন ভালো নার্সারি থেকে চারা সংগ্রহ করে রোপণ করতে হবে।

পলিব্যাগে উৎপাদিত চারা রোপণের ধাপগুলো চিত্রে দেখানো হলো

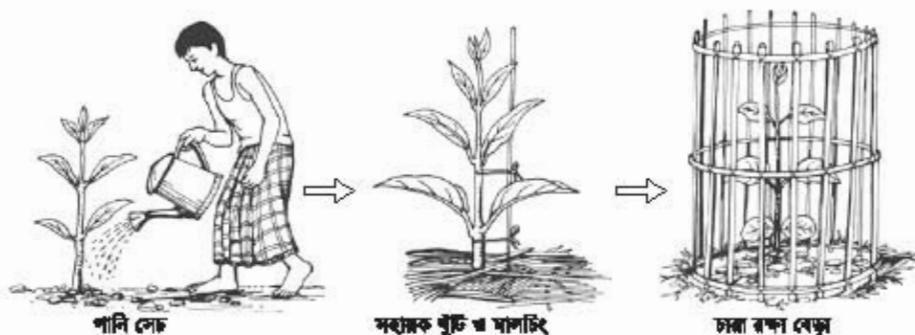


চিত্র : পলিব্যাগে চারা রোপণের বিভিন্ন ধাপ

চারা লাগানোর সময় প্রয়োজনীয় সাবধানতা

১. সতর্কতার সাথে পলিব্যাগটি ধরে একটি খারালো ব্রেড বা ছুরি দিয়ে পলিব্যাগটি কেটে অপসারণ করতে হবে।
২. খেয়াল রাখতে হবে চারার গোড়ার মাটি যেন ভেঙে না পড়ে।
৩. চিত্রের ঘর্তা করে চারাটি সাবধানে গর্তে বসিয়ে মাটি দিয়ে চারদিকের ফাঁকা অংশ ভরাট করে দিতে হবে।
৪. লাগানোর সময় চারাটির সবুজ অংশ যাতে মাটিতে ঢেকে না যায় সে বিষয়ে সতর্ক ধাকতে হবে।
৫. চারার গোড়ার মাটি একটু উঁচু করে দিতে হবে, যাতে গোড়ায় পানি জমতে না পারে।

চারার পরিচর্চা



চিত্র ১: চারা পরিচর্চার বিভিন্ন ধাপ

চারার শোভার আগমন নিয়মিত পরিকার করতে হবে। শীতকালে মাটির রস ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য চারার গোড়ার খড়কুটা বিছিরে মালচিৎ করতে হবে। তার মৌসুমে বিকেলে নিয়মিত পানি সেচ করতে হবে।

সার অঙ্গোগ :

চারার বৃক্ষ ভালো না হলে ৩-৪ মাস পরে সার অঙ্গোগ করতে হবে। চারাপ্রতি ৫০ গ্রাম ইউরিয়া সার দিতে হবে। চারার গোড়া থেকে ১২-১৫ সেমি দূরে চারার চারপিকে সরু শক্ত কাটি দিবে ৮-১০টি গর্ত করতে হবে। এ গর্তসমূহে ৫০ গ্রাম ইউরিয়া সার সমান ভাগ করে দিতে হবে। এভাবে সার অঙ্গোগ করাকে ডিবলিং পদ্ধতি বলে। মাটি উকনো থাকলে সার দেওয়ার পর যথেষ্ট পরিমাণ পানি দিবে পাঠের শোভার মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। অতিবছর বর্ষীর করতে একবার এবং বর্ষীর শেষে একবার সার অঙ্গোগ করা যেতে পারে। অতিবার ইউরিয়া ৭৫ গ্রাম, টিএসপি ৫০ গ্রাম এবং অঙগুপি ৫০ গ্রাম করে ডিবলিং পদ্ধতিতে চারার গোড়ার সার অঙ্গোগ করতে হবে। চারা রোপণের পরের ও বছর এভাবে সার অঙ্গোগের অঙ্গোজন হতে পারে।

কাজ : মাদুরাসার বাগানে দলগতভাবে চারা রোপণ কর।

নতুন শব্দ : মালচিৎ, ডিবলিং।

পাঠ-৯ : বস্তুবাদিত ছাদে, টবে ও মাদুরাসার বৃক্ষযোগ্যতা ও পরিচর্চা



চিত্র : বাড়ির ছাদে টবে বাগান



চিত্র : মাদুরাসার বাগান

বাড়ির ছাদে ও টবে লাগানোর উপযোগী গাছ

লেবু, কমলা, পেয়ারা, বিলিষি, কামরাঙ্গা, ডালিম, আশ্রপাণি, আম প্রভৃতি ফল গাছ। প্রায় সব রকমের ফুল গাছ বাড়ির ছাদে টবে চাষ করা যায়। লাউ, মরিচ, টমেটো, পুইশাক, বেগুনসহ বিভিন্ন রকম সবজির চাষ ছাদে টবে করা যায়।

কাজ : ১: তোমাদের মাদরাসায় কী কী ফল, ফুল ও কাঠ উৎপাদনকারী গাছ রয়েছে? তালিকা কর।

টবে চাষ পদ্ধতি

গাছ লাগানোর টব বিভিন্ন রকম ও আকারের হয়ে থাকে। তবে সক্ষ রাখতে হবে, গাছের আকার টবের আকারের উপর নির্ভরশীল।

৪৫ সেমি একটি টবের জন্য মাটি তৈরির নিয়ম

টবে চারা লাগানোর পূর্বে ২ ভাগ দোআশ মাটি ও ১ ভাগ গোবর সার একসাথে মেশাতে হবে। ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০ গ্রাম এমওপি সার ভালো করে মিশিয়ে ১৫ দিন রেখে দিতে হবে। এবার টবের ঠিক মাঝখানে কলম বা চারা রোপণ করতে হবে।

স্থায়ী বেড় পদ্ধতি

আমাদের দেশে বাগান করার জন্য বর্তমানে এটি একটি আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ছাদের চারাদিকে ২ মিটার প্রস্থের দুই পাশে ৫০ সেমি উচ্চ দেয়ালে ১৫ সেমি গাঁথুনির নেট ফিনিশিং চালাই দিয়ে তৈরি করতে হয়। মাঝখানে খালি জায়গার তলায় ৫ সেমি ইটের শুরুকির পরে ৫ সেমি গোবর সার দিতে হয়।



চিত্র : ছাদে স্থায়ী বেড

এবার ২ ভাগ দোআশ মাটি ও ১ ভাগ গোবর সার মিশিয়ে ভরাট করে স্থায়ী বেড তৈরি করা হয়। ছাদ চালাই ও দেয়াল গাঁথুনির প্রতিটি ক্ষেত্রে নেট ফিনিশিং দিতে হয়। এতে ছাদের কোনো রকম ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

টব বা ছাদের গাছের পরিচর্যা

১ কেজি পেঁচানো খাইলের সাথে ও লিটার পানি মিশিয়ে মধ্যম তরল তৈরি করতে হবে। ৪৫ সে.মি. টবের জন্য আধা লিটার, দ্রাঘ বা স্থায়ী বেডের জন্য ১ লিটার পরিমাণ দিতে হবে। ১৫ দিন পরপর নিয়মিত এ সার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। তরল সার প্রয়োগের ১ ষষ্ঠা আগে ও এক ষষ্ঠা পরে পানি দিতে হবে।

টবে লাগানো দীর্ঘজীবী গাছে নিয়মিত সেচ ও সার প্রয়োগ করতে হবে। এমনভাবে পানি দিতে হবে, যাতে টবের মাটিতে সর্বদা রস থাকে। সন্তানে দুইবার গাছের গোড়ার মাটি খুঁচিয়ে দিতে হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাগান

আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও বাইরে ফুল, ফল ও কাঠের গাছ রোপণ করা হয়। এ বাগানে কৃষ্ণচূড়া, কাঠালিচাপা, সোমালু, বাগান বিলাস, জারুল, গঞ্জরাজ, জবা, টগরসহ নানা রকম ফুলের গাছ লাগানো হয়। আবার মেহগনি, রেইনট্রি, আম, কাঠাল, নারকেল, সুগারি প্রভৃতি কাঠ ও ফলের গাছ রোপণ করা হয়।

আমাদের দেশে বিশেষ করে শীতকালীন ফুল বাগান খুব সুন্দর হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি ও সৌন্দর্য বর্ধনে এ ধরনের বাগান করা অপরিহার্য।

কাজ : দলীয় কাজ

মাদরাসা প্রাঙ্গনে রোপণ করা যায় এরকম ৫টি করে স্থায়ী বনজ, ফলদ ও স্থায়ী ফুল উৎপাদনকারী উদ্ভিদের নাম লেখ।

কাজ : সকল মাদরাসায় ফুলবাগান ও গাছপালা ঘেরা মনোরম পরিবেশ থাকা উচিত কেন? তা দলীয় আলোচনা করে পয়েন্ট আকারে পোস্টার কাগজে লেখ। শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : স্থায়ী বেড, দীর্ঘজীবী গাছ

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. আমাদের দেশের প্রাকৃতিক বন প্রকার।
২. উপকূলীয় বন থেকে প্রচুর পরিমাণে ও সংগ্রহ করা হয়।
৩. বসতবাড়ির দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে ও গাছ লাগানো উচিত।

বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. কৃষি বনায়নে বনজ বৃক্ষের সাথে	নিয়মিত সেচ ও সার দিতে হয়।
২. মরিচ, টমেটো, বেগুন ইত্যাদি	সবজির চাষ ছাদের টবে করা যায়।
৩. জনগণের কল্যাণেজনগণ সৃষ্টি বনায়ন	ফলদ বৃক্ষের চাষ করা হয়।
৪. টবে লাগানো দীর্ঘজীবী গাছে	সামাজিক বনায়ন নামে পরিচিত।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উপকূলীয় বন কাকে বলে?
২. সামাজিক বনের ২টি গুরুত্ব লেখ।
৩. বাড়ির ছাদের টবে লাগানো যায় এমন ৩টি গাছের নাম লেখ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পাহাড়ি বন ও সামাজিক বনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
২. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনের ভূমিকা আলোচনা কর।
৩. পলিব্যাগের চারা রোপণের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উপকূলীয় বনের প্রধান বৃক্ষ কোনটি?

- | | | | |
|----|-------|----|--------|
| ক. | গরান | খ. | জারঞ্জ |
| গ. | গর্জন | ঘ. | গেওয়া |

২. বাড়ির দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে নিচের কোন গাছ লাগানো হয়?

- | | | | |
|----|-------|----|-------|
| ক. | শরিফা | খ. | শিশু |
| গ. | জলপাই | ঘ. | সেগুন |

৩. নিচের কোনটি সামাজিক বনের বৃক্ষগুচ্ছ?

- | | | | |
|----|-----------------------|----|--------------------------|
| ক. | কড়ই, আকাশমণি, গামার | খ. | জারঞ্জ, রেইনট্রি, মেহগনি |
| গ. | মেহগনি, আকাশমণি, কড়ই | ঘ. | কড়ই, গর্জন, মেহগনি |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সালমা বেগম নিজ বাড়ির ছাদে ৪৫ সেমি আকারের ২০টি টবে বিভিন্ন প্রজাতির ফল ও ফুলের চারা রোপণ করে নিয়মিত পরিচর্যা করেন। তার বাগানে এখন মৌসুমি ফল ও ফুলের সমারোহ।

৪. সালমা বেগমের টবগুলোর জন্য কত কেজি টিএসপি সারের প্রয়োজন?

- | | | | |
|----|--------|----|--------|
| ক. | ১ কেজি | খ. | ২ কেজি |
| গ. | ৩ কেজি | ঘ. | ৪ কেজি |

৫. সালমা বেগমের উদ্যোগটি-

- i. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে
- ii. পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে
- iii. পরিবারের ব্যয় বৃদ্ধি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

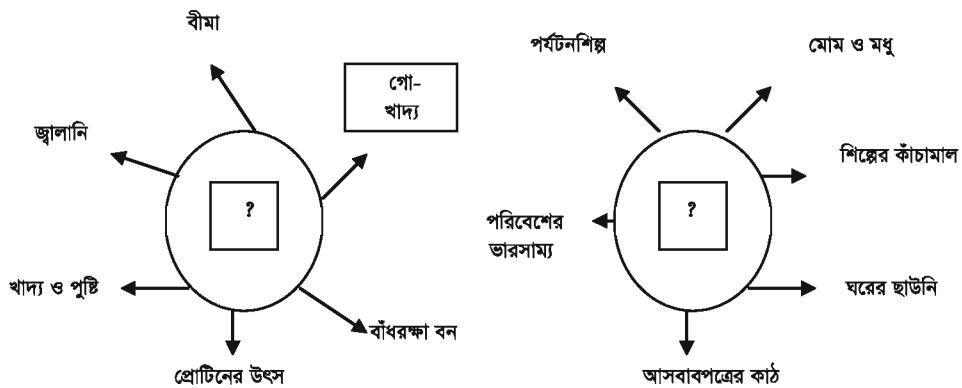
- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. রহিমা বেগম বসতবাড়ির আঙিনায় বৃক্ষরোপণের নিয়মাবলি অনুসরণ করে বাড়ির বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন প্রজাতির যেমন : নারিকেল, শিশি, পেয়ারা, জাম ইত্যাদি গাছ রোপণ করেন। আর এভাবেই নিজ বাগান থেকে পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা এবং বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

- ক. বন কাকে বলে?
- খ. সামাজিক বনের একটি গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
- গ. রহিমা বেগম উদ্বিধে উল্লিখিত গাছপালা বাড়ির কোন দিকে রোপণ করেন? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. রহিমা বেগমের উদ্যোগটি কীভাবে তার সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে তা বিশ্লেষণ কর।

২.



চিত্র : ক

চিত্র : খ

- ক. পাহাড়ি বন কাকে বলে?
- খ. কোন বনকে শালবন বলা হয়? ব্যাখ্যা কর।
- গ. উপরের চিত্রের কোন বনটির ভূমিগত বৈশিষ্ট্য ভিন্নতর? কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উপরের কোন বনটি সামাজিক বনায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? কারণ বিশ্লেষণ কর।

২০২০
শিক্ষাবর্ষ
দাখিল
৬ষ্ঠ-কৃষিশিক্ষা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন— দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে
নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোল
— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জীবসেবা পরম ধর্ম

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেটারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য